লটারির টিকিট

বিমল কর

অঙ্কুর প্রকাশনী ▯ সাঁইত্রিশের এ, কলেজ রো, কলকাতা-নয়

প্রকাশক :
হরিনারায়ণ বসাক
অঙ্কুর প্রকাশনী
৩৭এ, কলেজ রো
কলকাতা-৭০০০০৯

প্রকাশ কাল :
নবেম্বর ১৯৬১

মুদ্রাকর :
শ্রীকালীচরণ দাস
মহাকালী প্রেস
৯/ই গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৬

লটারির টিকিট
লটারির টিকিট
লটারির টিকিট

—এতে আছে—

ভাঙা আয়না, ফাটা কাপ আর শুকনো সজনেডাঁটার মতন এক ব্রাশ সামনে নিয়ে বিজন দাড়ি কামাতে বসেছিল। ব্লেডটাও পুরনো, ভোঁতা মেরে গিয়েছে। বিজনকে বেশ মেহনত করেই দাড়ি কামাতে হচ্ছিল। তিন দিনের জমা দাড়ি তো কম নয়।

দাড়ি কামানোর ব্যাপারে বিজনের যত আলস্য তত বিরক্তি। সে দু-চার বার দাড়ি রাখার চেষ্টা করে দেখেছে গোল মুখে দাড়িটা মোটেই মানাচ্ছে না। বন্ধুরা যা-তা বলছে। অগত্যা দাড়ি রাখার ব্যাপারে সে আর মাথা ঘামায়নি।

বিজনের ধাত হল আয়েসি। ভীষণ অলস। তাকে বিশ্বকুঁড়ে বললে বেশি বলা হয় না। গা-গতর যেটুকু নাড়ালে নয় তার বেশি নাড়াতে চায় না। মজা করে বলে, 'আমার তো তেলবাদশার নাতি হয়ে জন্মানোর কথা, ভুল করে এখানে জন্মে গিয়েছি। ভগবান মাঝে মাঝেই আমায় স্বপ্ন দিয়ে বলে দেন, বৎস বিজু, কিছু মনে কোরো না আমার কারখানায় তো কম্পিউটার নেই, একটা মস্ত ভুল হয়ে গিয়েছে। কোথায় তুমি আমির-বাদশার ঘরে জন্মাবে—তা না গিয়ে জন্মালে বাঁশবেড়েতে। আসছে-বার আর এ-ভুল হবে না। তোমার এ-জন্মের দুঃখ আসছে-জন্মে শোধ করে দেব সুদে আসলে।'

বিজনের অবশ্য তেমন কোনো দুঃখ আছে বলে মনে হয় না। অক্রুর দত্ত লেনের এক মেসবাড়িতে থাকে, চাকরি করে কলকাতা কর্পোরেশনের টিকসই দপ্তরে, বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে আড্ডা মারে দিনে বারো ঘণ্টা, আর যখন একা থাকে—মেসের বিছানায় শুয়ে বাঁশি বাজায়। এসবের বাইরে যদি কিছু থাকে তবে সেটা হল বিজনের মাছ ধরার শখ। কখনো-সখনো বিজন সঙ্গী জুটিয়ে কলকাতার বাইরে মাছ ধরতে যায়।

আজও দুপুরে বিজনের কলকাতার বাইরে যাবার কথা। দু-তিন বন্ধু মিলে যাবে মধ্যমগ্রাম। সেখান থেকে মাইল-দুই ভেতরের এক গ্রামে রাতটা কাটাবে; কাল সকাল থেকে বসবে মাছ ধরতে, বিকেলে ফিরবে আবার কলকাতা।

দাড়ি কামাতে কামাতে বিজন মধ্যমগ্রামের কথা ভাবছিল। হঠাৎ তার কানে গেল, নীচে একটা বীভৎস কান্নার রোল উঠেছে। ডাক ছেড়ে, আকাশ ফাটিয়ে কান্না বললে যেমন বোঝায় অনেকটা সেই রকম। কান্নার সঙ্গে যে-কথাগুলো ভেসে আসছে তা বোঝাই যাচ্ছে না।

বিজন দাড়ি কামানো বন্ধ করে কান পেতে রাখল। হল কী? কলকাতায় আছাড় খেয়ে পড়ে কারও মাথা ফাটল? পেনুঠাকুর গিরিধারীর গলা কুপিয়ে দিল নাকি? না বড়ালবাবুর কিছু হল?

বিজন উঠব কি উঠব না ভাবছিল। দাড়ি কামানোর আর সামান্য বাকি।

বিজনকে উঠতে হল না, হরিদা ঘরে এলেন। হরিদার স্নান শেষ। খিদিরপুরে ছুটতে হয়। দশটায় হাজিরা না দিলেই নয়, অফিস বড় কড়া।

হরিদা বললেন, "আমি কালকেই বলেছিলাম, ও বাবা পেনু, টিকিটটা সাবধানে রাখিস। বরাতে একবারই জুটে গিয়েছে। ছিলি রাখাল, হয়ে গিয়েছিস রাজা। হাতছাড়া করিস না টিকিটটা করলেই ডুববি, মারা পড়ে যাবি। তাই হল শেষ পর্যন্ত!"

বিজন খানিকটা আঁচ করতে পারল। তাদের মেসের পেনুঠাকুর লটারিতে দেড় লক্ষ টাকা পেয়েছে। এটা কালকের খবর। কাল মেসে হই হই কাণ্ড, পেনুঠাকুর লটারিতে টাকা পেয়েছে। দু-একশো নয়, লাখ-দেড়েক। মেসের সকলে মিলে পেনুকে বাহবা দিচ্ছে, তামাশা করছে তাকে নিয়ে, কেউ কেউ বা পেনুর হস্তরেখা ছক বিচার করছে, কেউ বা পেনুকে উপদেশ দিচ্ছে—টাকাটা হাতে পেলে কীভাবে তার সদ্ব্যবহার করা উচিত!

পেনুকে কাল কেমন থমকে যাওয়ার মতন দেখাচ্ছিল। লটারিতে টাকা পেয়ে একেবারে ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছে। না পারছে হাসতে, না কাঁদতে ; বিশ্বাস করতে পারছে আবার পারছে না ; এই একেবারে চুপ, তারপরেই বিড়বিড় করছে। পেনুর অবস্থা দেখে চাটুজ্যেদা এক ডোজ হোমিওপ্যাথি গুলি খাইয়ে দিল।

সন্ধের দিকে পেনু খানিকটা ধাতস্থ হয়ে কালীবাড়িতে পুজো দিতে ছুটল।

পেনু এই মেসবাড়ির তিন নম্বর গার্জেন। এক নম্বর গার্জেন হলেন বড়ালবাবু। বড়ালবাবু উনিশ শো ছেচল্লিশ সালে এই মেসবাড়ির পত্তন করেন, বড়ালবাবু আর মানিকদা। পেনু আসে পঞ্চাশ সালে। তার আগে বলরাম না কে যেন ছিল। কাজেই বড়ালবাবু আর মানিকদার পর তিন নম্বব হল পেনু। পেনু যখন বড়ালবাবুর কাছে আসে তখন তার বয়েস ছিল পনেরো বড়জোর। এখন পঞ্চাশ পার করে দিয়েছে। ছোকরা বয়েসে শিয়ালদায় চায়ের দোকানে চাকরি করত পেনু। বড়ালবাবু তাকে ধরে এনে ভাত ডাল মাছের ঝোল করতে শেখায়। চড়-চাপড়ও কম খায়নি পেনু বড়ালবাবুর কাছে। তা এ-সব পুরনো কথা বলে লাভ নেই, আসল কথাটা হল, পেনু হুট করে লটারির টাকা পাওয়ায় বড়ালবাবুর ঘুম বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। মানিকদা আজকাল আর মেসে থাকেন না, কাছাকাছি এক ভাড়াবাড়িতে থাকেন, তবে দিনের মধ্যে ছ-সাত ঘণ্টা মেসে এসেই বসে থাকেন। মানিকদা নাকি পেনুকে বলেছিলেন, 'আজকাল জাল টিকিটের ছড়াছড়ি চলছে, পেনু। তোরটা জাল না আসল আগে দেখতে হবে। আমাকে দিস—দেখিয়ে নেব।'

বিজন মানিকদাকে কোনো দোষ দিচ্ছে না, কিন্তু টিকিটটা জাল হতে পারে শুনে পেনু যেন কেঁদেই ফেলেছিল। মানুষকে এভাবে কেউ ঘাবড়ে দেয়! অবশ্য মানুষ মানুষই, তার দোষগুণ দুই থাকবে। মেস-বাড়ির ঠাকুর পেনু লটারিতে দেড় লাখ টাকা

পাওয়ায় কার না বুকে কমবেশি লেগেছে। বড়ালবাবু থেকে শুরু করে গজুবাবু পর্যন্ত সকলেরই। এমনকি বিজন, যার চালচুলো নেই, খাই দাই আড্ডা মারি করে দিন কাটাই, তার পর্যন্ত কেমন একটা খিচ লেগে গেল।

হরিদার কথায় বিজনের যেন অন্যমনস্কতা কাটল।

"পেনু একটা গাধা। গাধা না হলে কেউ হাতের মুঠো আলগা করে দেড় লাখ টাকা জলে ফেলে দেয়!"

বিজনের দাড়ি কামানো শেষ। এবার সব খেয়াল করতে পারছে। কেন যেন হঠাৎ একটু বেখেয়াল হয়ে গিয়েছিল।

"টিকিট হারাল কেমন করে?" বিজন জিজ্ঞেস করল।

"পেনুই জানে। এক-একবার এক-এক রকম বলছে। এখন আর পা ছড়িয়ে বসে ডুকরে বুক চাপড়ে কেঁদে কী হবে! তখন তো ভাল কথা কানেই তুলল না।"

বিজন গালের ওপর হাত বোলাতে লাগল। আজকালকার ব্লেডগুলো একেবারে বাজে। দুবার গালে তুললেই তার জান খতম হয়ে গেল। নিজের গাল দেখে বিজনের মনে হল, খুব একটা সাফসুফ হয়নি। চলে যাবে এই পর্যন্ত।

উঠে পড়ল বিজন আয়না ব্রাশ সেফটি রেজার নিয়ে হরিদাব ধুতি গেঞ্জি পরা শেষ, চুল আঁচড়ানোও হয়ে গিয়েছে। এবার খেতে যাবেন।

বিজন বলল, "মানিকদা নীচে নেই?"

"মানিক মিত্তির আর বড়ালবাবু মিলে ঘোঁট পাকাচ্ছে।"

"কিসের ঘোঁট?"

"কে জানে! দুটোই তো সমান।...তুমি যাই বলো বিজন, যাদের কানের লতি কাটা হয় তাদের আমি দু' চোখে দেখতে পারি না। মানিক মিত্তিরের কান দেখলেই লোকটাকে পয়লা নম্বরের ধান্ধাবাজ বলে মনে হয়।"

বিজন হেসে ফেলল। হরিদার কথাবার্তাই এইরকম। মনুষ্য-

চরিত্র বিচারের ব্যাপারে হরিদার এক ধরন আছে : কার কান ছোট কার কান খাড়া, কার চোখ বেশি লাল, কার কপাল চেটালো, কার নাক উঁচু—এই সব দেখে মানুষের স্বভাব বিচার করেন হরিদা। বিজনকে বলেন, তুমি হলে গবা-গোবিন্দ, তোমার কিছু হবে না।

হরিদা আর দাঁড়ালেন না, নীচে চলে গেলেন।

নীচে তখনও রই রই চলছে।

বিজন খানিকটা পরে নীচে নামল। স্নানের জন্যে তৈরি হবে।

নীচে নেমে দেখল, তখনও পেনু-পর্ব থামেনি। উঠোনে দাঁড়িয়ে অখিলদারা টিকিট হারানো নিয়ে কথা বলছেন। পেনু বারান্দায় একপাশে বসে আছে, খালি গা ; চোখমুখ বসে গেছে তার। একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলে যেমন দেখায় সেই রকম দেখাচ্ছে তাকে

উঠোনে তিনজন। দত্তবাবু, অখিলদা আর মেজোবাবু। দত্তবাবু বড়বাজারের এক বাঙালি ব্যবসাদারের গদিতে কাজ করেন, অখিলদা হলেন বুকিং ক্লার্ক, চৌরঙ্গিপাড়ার এক সিনেমা হাউসে টিকিট বিক্রি করেন, মেজোবাবুর স্টল আছে কলেজ স্ট্রিট মার্কেট।

দত্তবাবু বলছিলেন, "পেনু, তুমি বরং একটা কাজ করো। মলঙ্গা লেনে একজন আছে বাটি চালাতে পারে। তাকে ধরে নিয়ে এসো।"

অখিলদা বললেন, "রাখো তোমার বাটি চালা। ওসব বুজরুকি গাঁয়ে চলে, কলকাতা শহরে বাটিচালা, চালপোড়া চলে না। কেন তুমি ওকে বাজে ব্যাপারের মধ্যে যেতে বলছ, দত্ত! ধোঁকাবাজিতে কাজ হয় না।"

মেজোবাবু সামান্য তোতলা, তিনি বললেন, "চু-চু চুরি, আর ইয়ে কি-কিনা হা-রানো—এক জিনিস নয়। হা-হারানো জিনিসের খোঁজ কড়িচালায় পাওয়া যায়।"

"কড়িচালা? সেটা কী?"

"কালীঘাটে একজন আছে। মন-মন্তর পড়ে ক-কড়ি চালে বত্তি-বত্তিরিশ টাকা নেয়। গুণী লোক।"

"হ্যাত, যত্ত সবরদ্দি ব্যাপার," অখিলদা বললেন, "কড়িচালা!

বত্রিশ টাকা নেয়। এম. ডি. ডাক্তারের ভিজিট। না পেনু, তুমি একেবারে এসবের মধ্যে যাবে না। অনর্থক ছুটোছুটি, পয়সা খরচা ফালতু তোমায় নাচাবে।···তুমি আবার সব খুঁজে দেখো ঘরের, তোমার বাক্স-প্যাঁটরা তন্নতন্ন করে খোঁজো। না পেলে থানায় চলে যাও।"

"থানা!···তুমি কি পাগল নাকি অনিল? থানা কি মামার বাড়ি যে যা খুশি আবদার করা যায়!" দত্তবাবু নাক কুঁচকে বললেন।

"কেন, যাবে না কেন! চুরি গেলে লোকে থানায় ডায়রি করাতে যায় না! থালা বাটি টাকা থেকে সোনাদানা হিরে-জহরত পর্যন্ত যে-কোনো জিনিস চুরি গেলেই লোকে থানায় ডায়রি করাতে যায়। চুরি ইজ চুরি। এমন কোনো নিয়ম আছে যে এই জিনিসগুলো চুরি গেলে ডায়রি নেওয়া হবে, অন্যগুলো হবে না! এমন কোনো নিয়ম নেই। হরি ঘোষে থাকতে একবার একজনকে আমি কুকুরের বাচ্চা চুরি যাওয়ার জন্যে ডায়রি করতে যেতে দেখেছি।"

দত্তবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, "তোমার মাথা দেখেছ। এমন আজগুবি কথা বলো তুমি। পেনু থানায় গিয়ে ডায়রি করাবে—তার লটারির টিকিট চুরি গিয়েছে। মেরে পেনুকে থানা থেকে তাড়িয়ে দেবে, যাক না পেনু!"

বিজনের হাসি পাচ্ছিল। মজাটা জমেছে ভাল। বাটিচালা, চালভাজা-খাওয়া থেকে থানা পর্যন্ত গড়িয়েছে, এরপর এরা কী করবে?

মেজোবাবু বললেন. "থা-থানা এমনি চু-চুরিতেই কিছু ক-করে না তো ল্-ল-লটারির টিকিট। চু-চুরি না হা হারানো তাও ক্লিয়ার নয়।"

অখিলদা বললেন, "হারাবার কেস্ হলে পেনুর দোষ, কারও কিছু করার নেই। চুরির কেস হলে অন্য ব্যাপার।"

"কী বলছ তুমি?" দত্তবাবু চটে গেলেন, "এতগুলো লোককে তুমি চোর বলছ?"

"আমি বলিনি, তোমরাই বলছ! তোমরাই তখন থেকে বলতে শুরু করেছ, কেউ-না-কেউ টিকিটটা হাতিয়েছে।"

"বাজে বোকো না, কথাটা আমি বলিনি, যে বলেছে তাকে বলো।"

দত্তবাবুর কথা শেষ হতে না-হতেই বড়ালবাবু তাঁর গুমখানা থেকে বেরিয়ে এলেন। বড়ালবাবুর ঘরকে মেসের সবাই আড়ালে গুমখানা বলে।

বড়ালবাবু সোজা কথার মানুষ। এসেই বললেন, "আমি বলেছি, এই আমি বলেছি—" বলে বুকে বুড়ো আঙুল ঠুকলেন। গলা চড়িয়ে দিলেন আরেক ধাপ, "আমি বলেছি, এখনও বলছি, পেনুর টিকিট কেউ-না-কেউ হাতিয়েছে। আমি কারুর নাম বলিনি এতে যদি অপরাধ হয়ে থাকে, হোক। সত্যি কথা বলতে শিবু বড়ালের মুখে আটকায় না। বড়াল তোমাদের ডোণ্ট কেয়ার করে। আমি বলব আমার যা মনে হয়। এতে যার ইচ্ছে হয় মেসে থাকুক, যার মানে লাগবে মেস ছেড়ে দিতে পারে। আমি কচুর কেয়ার করি না।"

পাশেই খাবারঘর। পাত পেড়ে খাওয়ার বদলে এখন লম্বা সরু টেবিল আর বেঞ্চিতে বসে খেতে হয়। দু-চার জন নাকে মুখে গুঁজে নিয়ে উঠে পড়ছিল। তাদের মধ্যে আনন্দ ছিল অতি ফাজিল ছেলে। এঁটো হাতে বেরিয়ে এসে বলল, "বড়ালদা, চালে ভুল হচ্ছে আপনার। মেস ছেড়ে দিলে আর আপনি চোর ধরবেন কেমন করে! মেস কেউ ছাড়তে পারবে না, সবাইকার তল্লাসি হবে, ঘরদোর, বাক্স-প্যাঁটরা, মায় পরনের জামাকাপড়। প্রথমে সার্চ, তারপর কথা—তাই না!" বলে আনন্দ মুখ ধুতে কলতলায় চলে গেল।

ততক্ষণে মানিকদা বেরিয়ে এসেছেন বড়ালবাবুর ঘর থেকে।

বললেন, "আঃ শিবু, মাথা গরম কোরো না। ঘরে এসো। আমি একটা মতলব বার করেছি।"

বড়ালবাবু আবার তাঁর গুমখানায় ঢুকে গেলেন।

*   *   *

অফিসে গিয়ে বিজন শুনল, মধ্যমগ্রাম যাওয়া হচ্ছে না। পরিতোষ খবর দিয়ে গিয়েছে বাড়িতে একটা ঝঞ্ঝাট বেধেছে, সে যেতে পারছে না। আসছে শনিবার যাবে।

বিজন মুষড়ে পড়ল। সবে গরম পড়ছে। চৈত্র মাসের শুরু। ভেবেছিল কলকাতার বাইরে গিয়ে একটা দিন আমেজ করে আসা আসা যাবে. তা আর হল না।

বিকেলের দিকে বন্ধু মুকুলের সঙ্গে চা খেতে খেতে বিজন বলল. "পরিতোষ ডুবিয়ে দিল। কোথায় ভাবলাম আমজামের ছায়ায় বসে ঘুঘুর ডাক শুনব আর মাছ ধরব—দিল সব ভেস্তে।"

মুকুল বলল, "ঘুঘুর ডাক শুনতে মধ্যমগ্রাম যেতে হবে না, কলকাতায় কি কম ঘুঘু?"

বিজন প্রথমটায় বুঝতে পারেনি, তারপর বুঝল। বুঝে হেসে উঠল।

"তোকে একটা খবর দিতে ভুলে গেছি।" বিজন বলল।

"কী খবর?

"আমাদের মেসের পেন্নুঠাকুর লটারিতে দেড় লাখ টাকা পেয়েছে।"

"অ্যাঁ!···দেড় লাখ! বলিস কী!" মুকুল অবাক হয়ে বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। "কোন্ লটারি? ওয়েস্ট বেঙ্গল?"

"না।

"ওয়েস্ট বেঙ্গলেই টাকা কম, আর সব জায়গায় তিন পাঁচ সাত —লাখ লাখ টাকা।"

"এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল নয়। কিসের একটা চ্যারিটির।"

মুকুল হঠাৎ বলল, মজার গলায়, "লটারিতে টাকা পাওয়া লোক

আমি একটাও দেখিনি। শুনেই আসছি, এ পেয়েছে ও পেয়েছে। এই প্রথম চেনাশোনা একটা লোককে দেখব যে লটারিতে টাকা পেয়েছে। চল, আজ তোর মেসে গিয়ে পেন্নুঠাকুরকে দেখে আসি।"

"দেখতে যেতে পারিস, তবে মন খারাপ হয়ে যাবে।" বিজন যেন রহস্য করেই বলল।

"কেন? হিংসে হবে বলছিস! না রে ভাই, নো জেলাসি। লটারিতে যে টাকা পায় তার সাত জন্মের পুণ্য থাকে, আমার এক জন্মেরও নেই। চল্, একবার পেন্নুঠাকুরের গা ছুঁয়ে আসি।" মুকুল হাসতে লাগল।

বিজন বলল, "গা ছুঁয়ে লাভ হবে না। পেন্নু মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে রে! ধর, জলেই পড়ে গেছে।"

"মানে?"

"পেন্নুর টিকিটটাই হারিয়ে গিয়েছে! লস্ট।"

"হারিয়ে গিয়েছে! এই যে বললি প্রাইজ পেয়েছে।" বিজন এতক্ষণে একটা সিগারেট ধরাল। বলল, "পেয়েছিল। গত কাল পেয়েছিল। সন্ধে কি রাত পর্যন্ত পেন্নু দেড় লাখ টাকার মালিক ছিল কাগজে-কলমে। আজ সকালবেলায় তার সব টাকা গঙ্গায় পড়ে গিয়েছে। মানে, পেন্নুর টিকিটটা হারিয়ে গিয়েছে।"

মুকুল কেমন বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। কথা বলতে পারল না ক' মুহূর্ত। পরে বলল, "টিকিট হারিয়ে গেছে! বলিস কী রে।"

"হ্যাঁ। আবার কেউ কেউ বলছে, চুরি। টিকিটটা কেউ চুরি করেছে।"

"চুরি?"

"বলছে তো তাই।"

মুকুল ভাবল সামান্য, বলল, "হতে পারে। যে টিকিটে টাকা উঠেছে, সেই টিকিটটা যদি কেউ হাতে পায় ছেড়ে দেবে! চুরিও

হতে পারে। কিন্তু তোদের মেসে এমন কে আছে যে পেনুঠাকুরের টিকিট চুরি করবে।"

"কী জানি! আমি তো ভেবেই পাই না।"

"তবু ভেবে দেখ্ না একটু! কাকে তোর সন্দেহ হয়?"

বিজন মুকুলের চোখে চোখে তাকাল। "সকলকে।"

"সকলকে?"

"হ্যাঁ। টাকার লোভে যদি চুরি করতে হয়—সকলেই করতে পারে।"

"ও তো কথার কথা, "মুকুল বলল, "সবাই তো আর চোর নয়। কেউ একজন করেছে। কে কে করতে পারে সন্দেহ হলে তবে না চোর ধরার চেষ্টা হতে পারে।"

বিজন হাসল। বলল, "দেখ ভাই, যদি প্রয়োজনের কথা ধরিস আমরা যারা বড়ালবাবুর মেসে থাকি, আমাদের কাছে দেড় লাখ টাকা আর দেড় লাখ টাকা হাতাবার চেষ্টা এক নয়। এখন যদি তুই বলিস—টাকা হাতাবার মতন ধুরন্ধর কে কে আছে, তা হলে অবশ্য ভাবতে হবে।"

"তাই ভাব।"

"ভেবে লাভ! আমি কি গোয়েন্দা? না আমায় কেউ গোয়েন্দাগিরি কাজটা দিচ্ছে? তা ছাড়া চুরির ব্যাপারটা ফালতু হতে পারে। পেনু হয়তো টিকিটটা হারিয়েছে। অনর্থক চোর খুঁজতে গিয়ে সময় নষ্ট করব কেন?"

* * *

মেসে ফিরতে ফিরতে বিজনের রাত হল সামান্য। মুকুলের সঙ্গে সিনেমায় গিয়েছিল, সিনেমা-ফেরত মেসে। ঘরে পা দিতে না-দিতেই শুনল, আজ বিকেলের দিকে জবরদস্ত ঝগড়া গলাবাজি হয়ে গিয়ে গিয়েছে। সেই ঝগড়ার জের বড় জোর ঘণ্টাখানেক হল থেমেছে।

ব্যাপার কী?

হরিদা বললেন, তিনি ফিরেছেন সন্ধের মুখে, সবিস্তারে বলা তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তবে তিনি এসে যা শুনেছেন যা দেখেছেন বলতে পারেন। ঝগড়ার শুরু অনাদি চাটুজ্যেকে নিয়ে। অনাদি প্রতি শনিবার বাড়ি যায়, ফেরে সোমবার অফিস-ফেরত। অনাদির বাড়ি ছোটজাগুলিয়া। বাড়ি যাবে বলে অনাদি তৈরি হচ্ছিল। টুকটাক জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়েছে সে—হঠাৎ বড়ালবাবুর হুকুম হল, মেস ছেড়ে বাড়ি যাওয়া চলবে না।

তার মানে? যাওয়া চলবে না মানে?

মানে, কাল সকালে তালতলা থেকে নবীন সাঁই আসছে। নবীন সাঁই হারানো জিনিস, চুরি যাওয়া জিনিসের হদিস বলে দিতে পারে। আরও অনেক কিছু পারে। লোকটা গুপ্তবিদ্যা জানে। তবে নেশাভাঙ করে নিজের গুণ নষ্ট করছে।

অনাদি চটে লাল হয়ে গেল বড়ালবাবুর ওপর। সে সামান্য চাকরি করে, গরিব, দেশে চার-পাঁচজন পুষ্যি বলে বড়ালবাবু তাকে চোর বলে সন্দেহ করবে? এই অবস্থায় সকলেরই আত্মসম্মানে লাগার কথা, অনাদিরও লাগল। ঝগড়া শুরু হয়ে গেল বড়ালবাবু আর অনাদিতে।

সেই ঝগড়াই গড়াতে লাগল, অফিস-ফেরতা নিবারণদা ও আরও কেউ কেউ এসে পড়ায় ঝগড়া জমে গেল। শেষ পর্যন্ত দুটো দল হয়ে গেল বাবুদের মধ্যে। বড়ালবাবু, মানিক মিত্তির, যতীনবাবু—এরা একটা দল, জনা চারেক হবে বড়ালবাবুর দলে। বাকি ছ'জন অনাদির দলে। জনা-দুয়েক তখনও ফেরেনি, অন্য দুজন অফিস থেকেই বাড়ি চলে গিয়েছে—বড়ালবাবু তাদের আটকাবার সুযোগই পাননি।

ঝগড়ার শেষ কখনও হয় নাকি? তখনকার মতন চাপা পড়েছিল। বড়ালবাবুর ব্লাডপ্রেসার বেড়ে যাচ্ছিল, মাথা আর মুখ কোনোটাই ঠিক ছিল না বলে ঝগড়াটা তখনকার মতন থেমে গিয়েছিল। ভেতরে ভেতরে গজরাচ্ছিল দুই পক্ষ।

হরিদা বললেন, "বড়ালবাবুরা মেসটা তৈরি করেছিলেন বলে তার মালিক হয়ে গেছেন—এমন ব্যবহার করেন। জিনিসটা ভাল না। তুমি যদি মালিকানা করবে—এটাকে হোটেল করে ফেলো, বিজনেস লাইসেন্স নাও, খাতাপত্তর করো, অফিস করো। কিছুই করব না, বসে বসে মালিকানা করব, তাই কি হয় নাকি ?"

বিজন বলল, "ঠিকই বলেছেন। তবে বড়ালবাবুর তো আর কিছু করার নেই, খোঁড়া মানুষ, একা লোক. খবরদারি করার নেশা ছাড়তে পারেন না।"

হরিদা বললেন, "এবার ছাড়তে হবে হে। দিনকাল পালটে যাচ্ছে, বুঝছ না। মাতব্বরি আর সহ্য করবে না কেউ।"

বিজন কিছু বলল না।

গা-হাত ধুয়ে বিজন গেল ছাদে একটু পায়চারি করতে। ছোট ছাদ। আলসের অর্ধেকই ভাঙাচোরা। প্রচণ্ড গরম পড়লে মেসের অনেকেই রাত্রে ছাদে মাদুর বিছিয়ে শোয়। সন্ধের দিকেও পায়চারি, গল্পগুজব করে অনেকেই।

ছাদে এখন কেউ ছিল না। বিজন অলসভাবে পায়চারি করতে লাগল। আকাশভরা তারা। আজ কী তিথি কে জানে। মাঝে-মাঝে ফুরফুর হাওয়া দিচ্ছিল। চার দিকের বাড়িগুলো এমন গায়ে-গায়ে বাঁকাচোরা ছাঁদে দাঁড়িয়ে আছে যে, ভাল করে হাওয়াও আসে না। বিজনের শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছিল, মোটামুটি, ঠাণ্ডা রয়েছে ছাদে, আরাম লাগছিল।

নোংরা ছাদ। ধুলোময়লায় ভর্তি। বিজনের শোয়া হল না। নীচে নেমে গিয়ে মাদুর শতরঞ্জি আনতেও তার উৎসাহ নেই, অলসভাবে পায়চারি করতে লাগল।

আর হঠাৎ তার মনে হল, পেন্নুর টিকিট হারানো নিয়ে গোয়েন্দা-গিরি করলে কেমন হয়। মুকুল যা বলছিল, সময় কাটবে, ঘিলু সাফ হবে, চাই কি উত্তেজনাও হতে পারে—তেমন তো হতেই পারে।

বিজনের নিজেরই হাসি পেল। আবার ভাবল, হাসির কিছু

নেই। দেড় লাখ টাকা চুরি সোজা কথা নয়। এখন না-হয় টাকার দাম গোয়ালার দুধের মতন হয়ে গেছে--বিশ-পঁচিশ বছর আগে হলে কী হত ?

বিজন গোয়েন্দা-বই অজস্র পড়েছে। হাতে এলে এখনও পড়ে। একজন গোয়েন্দার মগজ এমন কিছু নয়। বইয়ের গোয়েন্দারা লেখকের বরপুত্র যেন, লেখকরাই তাদের বাঁচায়। লেখকের জন্যেই তারা সব গোয়েন্দা. নয়তো বুদ্ধির খেলা এমন কী রয়েছে তাদের।

বিজন একবার গোয়েন্দা হয়ে দেখতে পারে—ব্যাপারটা কেমন ?

এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

এ-বাড়ির ছাদের সিঁড়ি কাঠের। খোলা সিঁড়ি। সেকেলে বাড়িতে আকছার যেমন দেখা যায় এদিকে।

পায়ের শব্দ হচ্ছিল।

একটু পরেই আনন্দকে দেখা গেল। বিজনেরই সমবয়েসি। চাকরি করে পোর্টে। পাওয়ার লিগে ফুটবল খেলে। সব ব্যাপারে তুখোড়। ঠোঁটকাটা। দেখতেও ভাল। বিজনকে 'বিজনদা' বলে, বয়েসের জন্যে নয়, আদর করেই !

আনন্দ বলল, "হরিদা বললেন, তুমি ছাদে। হাওয়া খাচ্ছ ?"

বিজন মাথা নাড়ল গম্ভীরভাবে। মজার ভাবটা প্রকাশ করল না। বলল, "চিন্তা করছিলাম।"

"চিন্তা, কিসের ?

"বল্ তো কিসের চিন্তা ?"

"জানি না। তোমার আবার চিন্তা।...তুমি মেসের কেচ্ছার কথা শুনেছ ? এখানে আর থাকা যায় না। ভদ্দরলোকের মেস, না ছোটলোকের ?"

বিজন বলল, "সব শুনেছি। নিজের চোখেও তো কিছু কিছু দেখছি। আমি ঠিক এই ব্যাপারটাই ভাবছিলাম আনন্দ। ভাবছিলাম, একবার গোয়েন্দাগিরি করলে কেমন হয় ?"

"গোয়েন্দাগিরি ? মানে ?"

"মানে—পেনুর লটারির টিকিট নিয়ে গোয়েন্দাগিরি।"

আনন্দ যেন বিরক্ত হল। "তোমার সব ব্যাপারে তামাশা।"

"না রে। তামাশা নয়। সিরিয়াসলি বলছি।" বলে বিজন আনন্দকে টেনে নিয়ে চলে গেল ছাদের পশ্চিম কোণে। গঙ্গাজলের ট্যাংকের কাছে। নামেই ট্যাংক। কবেকার একটা ট্যাংক, ফুটোফাটা হয়ে পড়ে আছে। আজকাল আর জলও ওঠে না।

ট্যাংকের পাশে সিমেন্টের উঁচুমতন জায়গা খানিকটা, কোনো-রকমে বসা যায়। বিজন আনন্দকে টেনে নিয়ে ভাগাভাগি করে বসল। বলল, "আমাদের ইন্‌ভেস্‌টিগেশানের কোড নাম হবে অপারেশন পি।" বলে বিজন হোহো করে হেসে উঠল।

আনন্দও হেসে ফেলল।

হাসি থামলে বিজন বলল, "এবার কাজ শুরু করা যাক। ফাজলামি নয়।···আচ্ছা, প্রথম কথা হল, আমাদের গোড়ায় গলদ করলে চলবে না। প্রথমেই দেখতে হবে, পেনু টিকিট হারিয়ে ফেলেছে কিনা। যদি হারিয়ে ফেলে থাকে—তবে কারও কোথাও দোষ নেই।"

"কেমন করে বুঝব হারিয়েছে কিনা?"

"পেনুকে খুঁচিয়ে জানতে হবে।"

"পেনু তো এখনও থেকে থেকে ভিরমি খাচ্ছে।"

"যাক্। টিকিট খুঁজে দেব শুনলে জ্যান্ত হয়ে বসে পড়বে। দেড় লাখ টাকা।"

"তা ঠিক।" আমরা ধরে নিচ্ছি, অনুমানে, হারায়নি। টিকিটটা চুরি গেছে।"

"ধরলাম।"

"তা হলে কে চুরি করল?"

"কেনই বা করবে?"

"ঠিক। যে চুরি করেছে—সে টাকার লোভে করেছে। এই সব লটারির টিকিটে কোনো নাম থাকে না। কেনার সময়ও কেউ

নাম লিখিয়ে নেয় না। নম্বরই আসল। তোর জিনিস আমি যদি হাতিয়ে নি—টাকাটা আমিই পাব।"

"তা পাও। আমার কপালে লটারি নেই। দু-চার বার ওয়েস্ট বেঙ্গল কেটেছি। দশ মাইল তফাত দিয়ে প্রাইজগুলো বেরিয়ে গিয়েছে।" আনন্দ হাসল।

বিজন বলল, "চুরি যদি হয়ে থাকে, মেসের কেউ করেছে।"

"কেন? বাইরের লোক করতে পারে না? পেন্নু বাইরের কাউকে টিকিট দেখায়নি? পেন্নুর কাছে বাইরের লোক পান-গুণ্ডি খেতে আসে না? গল্প করতে আসে না? পেন্নুর ঘরে যে দুপুরবেলা টুয়েন্টি নাইন তাস চলে, সেই তাসের দলও তো টিকিট চুরি করতে পারে।"

"পারেই তো। সেটাও বিবেচনা করতে হবে।···তবু ধরে নেওয়া যাক মেসের কেউ চুরি করেছে। টাকার লোভেই করেছে। এবার কথা হল, আমরা কাকে কাকে বেশি সন্দেহ করব, কাকে কম, কাকে একেবারেই করব না।"

"তুমিও তা হলে সন্দেহের মধ্যে পড়ছ?"

"তুই আমি—সবাই। একমাত্র বাদ যাচ্ছে দাশদা, কেননা দাশদা গত পাঁচ দিন থেকে মেসে নেই। ও. কে.?"

মাথা নাড়ল আনন্দ।

বিজন বলল, "এবার আমাদের মেসের ডিটেলটা একটু দেখা যাক। বাড়িটা আড়াইতলা। আড়াইতলাও নয়—পৌনে-দু'তলা। বাসিন্দে জনা-পনেরো।"

"নাম বলব বাসিন্দেদের?"

"বল।"

"বড়াল দি গ্রেট, মেজোবাবু, দত্তবাবু, হরিদা, চাটুজ্যেদা, অখিলদা, দাশদা, নিবারণদা, জ্যোৎস্নাবাবু, গানের মাস্টার, তুমি, আমি, করালীবাবু আর যতীনবাবু। সব নামই বললাম তো?"

"বলেছিস বোধহয়।···এর মধ্যে মানিকদা নেই. তাঁকেও ধরতে হবে। তাঁর দশ আনা এখানে, ছ আনা বাড়িতে।"

"লোকটাও জাঁহাবাজ।"

"মানিকদার মতন জাঁহাবাজ, ধূর্ত, চারদিকে নজর রাত্রে, লোভী আর কে কে আছে?"

আনন্দ সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না। ভাবছিল। শেষে বলল, "জ্যোৎস্নাবাবু লোকটাও সুবিধের নয়। শুনেছি ওর বিস্তর ধারদেনা, জুয়াটুয়াও খেলে, মারদাঙ্গা টাইপের।"

"গানের মাস্টারকেও তুই সাসপেক্ট হিসেবে ধরতে পারিস। আমি ওকে রিজেন্ট সিনেমার কাছে রেস্টুরেন্টে ফেকলু সিনেমা পার্টির ছোঁড়াদের সঙ্গে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা মারতে দেখেছি। কিসের একটা সিনেমা করবে বলে বোলচাল দিচ্ছিল। গানের মাস্টার ধারে ডুবে আছে। বড়ালবাবু প্রায়ই বলেন, ওকে আর মেসে রাখা যাবে না। মেসের প্রত্যেকের কাছে ওর বিশ পঁচিশ পঞ্চাশ টাকা ধার।" বলে একটু থেমে আবার বলল, "অথচ বড়ালবাবু গানের মাস্টারকে তাড়ায় না।"

"কাল আবার মাথা ফাটিয়ে বসল মাস্টার।"

"শুনলাম। লেগেছে জোর?"

"না, মারাত্মক কিছু নয়?...মাঝরাত্তিরে বাতি না জ্বেলে কেউ ওই কলতলা দিয়ে বাথরুমে যায়? বুদ্ধিখানা কী!"

বিজনের হঠাৎ যেন মাথায় কী এসে গেল হাত তুলে বলল, "দাঁড়া দাঁড়া, এটা তো ভেবে দেখিনি।...হ্যাঁ, হতে পারে, হতে পারে। গানের মাস্টাররা থাকে নীচের তলায়। গানের মাস্টার, বড়ালবাবু, দাশদা, মেজোবাবুর দল। আমাদের পেন্নু আর গিরিধারীর ঘরও কাছাকাছি। গানের মাস্টার অন্ধকারে বাথরুমে যেতে গিয়ে কলতলায় পা পিছলে পড়েছে, না, দু নম্বর চোর তাকে অন্ধকারে দেখতে পেয়ে মাথায় মেরেছে?"

আনন্দ বোকার মতন বিজনের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। গল্পের গোরু গাছে ওঠে, গোয়েন্দাদের মাথা যেমন সাফ তাতে গোরুকে পাহাড়েও চড়িয়ে দিতে পারে। আনন্দ বলল, "তুমি আবার দু নম্বরও পেয়ে গেলে!"

* ২নং পৃ. বিজনে দাড়ি কামানো বন্ধ করে কনেপেতে রাখল ? হল কী ?
উঠোনে তিনজন, দত্তবাবু, অখিলদা, আর মেজোবাবু।

বিজন বলল, "আমি যদি গোয়েন্দা হই, চারজনকে অন্তত সাসপেক্ট করব। মানিকদা এক নম্বর, দু নম্বর গানের মাস্টার, তিন নম্বর জ্যোৎস্নাবাবু, চার নম্বর পেন্নুর মনিব বড়ালবাবু।"

আনন্দ আঁতকে উঠে বলল, "সর্বনাশ বিজনদা, তুমি বড়ালবাবুর নামও মুখে এনো না, মেস থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে।"

"অত সস্তা! দিক না বার করে! কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলা গাড়ি করে বড়ালচাঁদকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধাপায় জমা করে দেব।"

আনন্দ জোরে হেসে উঠল। বিজনের মতন নিরীহ, সাদামাটা, শান্ত লোক যখন বিক্রম দেখাবার কথা বলে তখন না হেসে পারা যায় না।

বিজন নিজেও হাসছিল।

হাসাহাসি শেষ হলে বিজন বলল, "তুই একটা সোজা কথা বল তো! ওই বড়ালবাবু আর তার শাকরেদ মানিকদা—দুজনে মিলে গুমখানায় বসে কিসের ফন্দি আঁটছে সারাদিন? আমি দুটোকেই ঘোরতর সন্দেহ করি।"

আনন্দ বলল, "ওঁরাই আবার মাতব্বরি বেশি করছেন।"

"তা তো করবেনই। পেন্নুর গার্জেন যে।"

"তা হলে নবীন সাঁই? বড়ালবাবু যে নবীন সাঁইকে আনছেন কাল?"

"বোগাস। নবীন সাঁই কী করবে! সে বেটা বড়ালবাবুদের পয়সা খাওয়া লোকও হতে পারে। পুরো ব্যাপারটা অন্য দিকে চালিয়ে দেবে। ওটা ধাপ্পাও হতে পারে।...যাকগে, আমাদের কাজ আজ থেকেই শুরু করা যাক। তুই পেন্নুকে ধর। ডিটেল জেনে নে। আমি অন্যদের ওপর চোখ রাখছি।"

* * *

বেলা গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল, তালতলার নবীন সাঁই এল না। মেসের মধ্যে একটা চাপা গুমোট অবস্থা চলেছে। বড়ালবাবুর ওপর রাগে গজরাচ্ছিল অনেকেই। বড়ালবাবুর হুকুম ছিল, নবীন

না আসা পর্যন্ত কেউ যেন মেসবাড়ি ছেড়ে না যায়। অবশ্য এমনিতে মেসবাড়ির বাসিন্দেরা রবিবারের সকালটা যে যার নিজের কাজকর্মের জন্যে রাখে। সারা সপ্তাহের জমানো কাজ—চুলকাটা, জুতো সাফ থেকে জামাকাপড় চাদর গেঞ্জি কাচা পর্যন্ত—যার যা জমে আছে সেরে ফেলে। তবে নিজের মর্জিতে মেসে থাকা আর হুকুম মেনে মেসে বসে থাকার মধ্যে অনেক তফাত।

বড়ালবাবুর হুকুম মানতে আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত অকারণ অশান্তি বাড়াল না কেউ। মনে মনে খেপে থাকল। বড়ালবাবুকে দেখে নেব-গোছের এক ভাব নিয়ে সকালটা কাটিয়ে দিল।

আনন্দ আর বিজন নিজেদের মতন করে গোয়েন্দাগিরি শুরু করল। ওদের ভাবভঙ্গি থেকে বোঝার উপায় ছিল না—কোনো মতলব এঁটে নেমেছে দুজনে।

বিকেলের দিকে দুজনে গেল গলিতে চায়ের দোকানে চা খেতে। কথাবার্তা সেখানেই হবে।

দোকানে বসে আনন্দ বলল, "বিজুদা, পেনুর টিকিট নিয়েই তো গোলমাল আছে।"

বিজন অবাক হয়ে বলল, "সে কী! জাল টিকিট নাকি?"

"সাচ্চা ঝুটা জানি না। ব্যাপারটা বলি তোমায়—শোনো।"

আনন্দ যা বলল তার থেকে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়ায়। পেনু হল ঝাড়গ্রামের লোক। বাড়ি কাছে বলে প্রায়ই তাঁর আত্মীয়-স্বজনরা পেনুর কাছে আসে এক-আধবেলা থাকতে, খোঁজখবর নিতে পেনুর নিজের কোনো সংসার নেই, বিয়ে-থা করেনি। তার গ্রামতুতো ভাইপো-ভাগ্নের সংখ্যাই বেশি নিজেরও দু-চারজন আছে। এক ভাগ্নে এসেছিল ক'দিন আগে। সে কলেজ স্ট্রিট থেকে একটা টিকিট কিনে এনে দিয়েছিল পেনুকে। কেন দিয়েছিল তাও পেনু জানে না। ভাগ্নে বলেছিল, দোকানের কাছে দাঁড়িয়ে-ছিলাম, তমলুকের লোক, গপ্পটপ্প হচ্ছিল—তা একটা টিকিট কেটে নিলুম। তুমি রেখে দাও, মামা।

এই দোকানটা পেনু জানে না, চোখেও দেখেনি। কলেজ স্ট্রিটের তামাম এলাকায় লটারির দোকান কি কম!…তা টিকিটের কথাও পেনু ভুলে গিয়েছিল। কথাটা জানত গিরিধারী, পেনুর অ্যাসিটেন্ট। মানে মেসবাড়ির রান্না, মসলাবাটা, খেতে দেবার সময় থালা গ্লাস এগিয়ে দেওয়ায় পেনুর ডানহাত। গিরিধারী মেজোবাবুদের ঘরে গিয়েছিল চা দিতে সকালবেলায়, টাটকা খবরের কাগজ হাতে করে মেজোবাবুরা পাতা ওলটাতে-ওলটাতে কী কথায় যেন লটারির টিকিটের কথা বলছিলেন। গিরিধারীর মনে পড়ে গেল, পেনুর কাছে একটা টিকিট আছে। সে অতশত বোঝে না। এসে পেনুকে বলল।

পেনু তার টিকিট নিয়ে গেল বড়ালবাবুর কাছে। এই মেসে তিনটে বাংলা কাগজ আসে। একটা কাগজ কেনেন বড়ালবাবু, একটা কেনেন মেজোবাবু আর অন্য কাগজটা যায় হরিবাবুর কাছে। তিনটে বাংলা হলেও তিন নামের কাগজ। অন্য বাসিন্দেরা কাগজ কেনে না, চেয়েচিন্তে দেখে নেয়।

বড়ালবাবু পেনুর টিকিট মেলাবার পর নিজে থেকে কিছু বলেননি, চুপ করে ছিলেন। বড়ালবাবুর সামনে ছিল অনাদি, সে হঠাৎ টিকিটটা টেনে নিয়ে কাগজ দেখে মিলিয়ে নিল। তারপর চেঁচিয়ে বলল, 'পেনু এ যে তোমার টিকিটের নম্বর! ফাস্ট প্রাইজ।'

বড়ালবাবু ভীষণ চটে গিয়েছিলেন অনাদির চেঁচামেচিতে। এইভাবে চেঁচিয়ে টাকার ব্যাপার বলতে হয়!

তা পেনুর লটারিতে ফার্স্ট প্রাইজ পাওয়ার খবরটা তারপরই মেসের মধ্যে রটতে থাকে। মুখে মুখে সেটা বাইরেও সামান্য রটেছিল কিনা কে জানে।

বিজন মন দিয়ে সব শুনছিল। চা খেতে খেতে বলল, "বড়ালবাবুর এত সাবধান হবার কারণ অতগুলো টাকা একজন মেসের বামুনঠাকুর পেয়েছে—এটা চট করে রটিয়ে দিতে চাননি?"

"উলটোটাও হতে পারে," আনন্দ বলল, "পেনুঠাকুর লেখাপড়া

জানে না। তার টিকিটে টাকা উঠেছে—এটা যদি তাকে না জানিয়ে সরিয়ে ফেলা যায়, তবে লুকিয়ে লুকিয়ে টাকাটা নিজে হজম করা চলে।"

"তাতে খানিকটা রিস্ক আছে।...পেনু যদি টিকিটটা ফেরত নিয়ে অন্য কাউকে দেখায়।"

"তাই কি কেউ দেখায়! একবার দেখলাম—নম্বর মেলালাম. হল না—ফুরিয়ে গেল। সেই টিকিট নিয়ে কেউ আর মাথা ঘামায় না। আরে আমরাও তো এক-আধবার কেটেছি। যেই দেখেছি ফক্কা, টিকিটটা দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছি। পেনু, যে বেচারি টিকিটের 'ট' বোঝে না, তার কাছে একটুকরো ছাপা কাগজের কী দাম!" বলে আনন্দ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বার করল।

বিজন বলল, "তার মানে তুই ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে চাইছিস বড়ালবাবুর তাল ছিল পেনুকে মিথ্যে কথা বলে টিকিটটা হাতানো?"

আনন্দ মাথা হেলিয়ে বলল, "হতে পারে।"

বিজন আনন্দের দেওয়া সিগারেট ধরাল। ধোঁয়া টানল জোরে জোরে, বলল, ব্যাপারটা তা হলে এইভাবে দাঁড় করানো যাক।"

বাধা দিল আনন্দ। বলল, "তুমি কি জানো, মানিকদা পেনুকে বলেছিলেন, টিকিটটা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে—তিনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।"

"পেনু বলল?"

"হ্যাঁ, পেনু বলল, মানিকবাবু তাকে আড়ালে ডেকে চুপিচুপি টিকিটটা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে বলেছিলেন। পেনু রাজি হয়নি।"

"ও!...এখন তা হলে দুই বন্ধু—বড়ালবাবু আর মানিকদা গুমখানায় বসে কিসের পরামর্শ করছেন?"

"কী জানি।"

বিজন সামান্য চুপচাপ থেকে বলল, "এবার তা হলে একটা

সিম্পল ম্যাথামেটিক্স করে এগুনো যাক আনন্দ। পয়েন্টগুলো হল, আমরা বড়ালবাবু আর মানিকদা দুজনকেই সন্দেহ করছি। বড়ালবাবুকে করছি—কারণ—বড়ালবাবু পেন্নুর টাকা পাবার খবর পেন্নুকে বলতে চাননি প্রথমে। আর মানিকদাকে করছি—কারণ, তিনি চুপিচুপি আড়ালে পেন্নুকে বলেছিলেন টিকিটটা তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখতে। তবে এই সন্দেহ নিছকই সন্দেহ, ধোপে টিকবে কি না বলা মুশকিল।"

"কেন?"

"বড়ালবাবুর কথা ধর। বড়ালবাবু বলবেন, পেন্নুর মতন মানুষকে ঝপ করে দেড় লাখ টাকার খবর দিলে মানুষটার মাথার গোলমাল হয়ে যেতে পারে বলে ঝট করে খবরটা দিতে চাননি। রইয়ে-সইয়ে দিতেন। তা ছাড়া, খবরটা বেশি জানাজানি হয়ে গেলে টিকিট চুরির ভয় ছিল—যা শেষ পর্যন্ত সত্যিই চুরি গেল।"

"পেন্নুও বলছে, টিকিট চুরি গিয়েছে। আমি তাকে নানা কায়দা করে জিজ্ঞেস করেছি। প্রতিবারেই এক কথা। টিকিটটা সে তার ঘরে কাঠের বাক্সের মধ্যে রেখেছিল।" আনন্দ বলল।

কথাটা কানে তুলল না যেন বিজন, বলল, "মানিকদাকে আমরা সন্দেহ করছি। কিন্তু মানিকদাও বলতে পারেন—বাপু, দেড় লাখ টাকার টিকিট, কোথায় হারিয়ে ফেলবে পেন্নু—তাই আমার কাছে রাখতে বলেছিলুম। রাখতে বলেছি বলেই আমি চোর!"

আনন্দ বলল, "কেউ যদি চোর নয় তা হলে চোর কে?"

"আমাদের অন্য দুজন সাসপেক্ট ছিল: গানের মাস্টার আর জ্যোৎস্নাবাবু এর মধ্যে গানের মাস্টার কাল মাঝরাতে মাথা ফাটিয়েছে। বলছে—কলতলায় পড়ে গিয়েছিল। তা সে যেতে পারে। আবার এমনও হতে পারে, পেন্নুর ঘরের দিকে যে-চোর পাহারা দিয়ে বসে ছিল সে গানের মাস্টারকে জখম করেছে। গানের মাস্টারের সঙ্গে কথা বলেছিস?"

"না, তেমন কথা কিছু নয়। এই এমনি দু-চারটে কথা।

"ওকে দেখে কী মনে হল?"

"বুঝতে পারিনি।"

"হুঁ! আর আমাদের জ্যোৎস্নাবাবু?"

আনন্দ দু-চারটে টান মারল সিগারেটে। ভাবল কিছু। বলল, "জ্যোৎস্নাবাবু গভীর জলের মাছ। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা গেল না।"

বিজন চায়ের কাপ অনেক আগেই শেষ করেছিল আবার দু'কাপ চায়ের হুকুম করল। তারপর আনন্দর দিকে তাকিয়ে বলল, "চোর কে তা ধরা না গেলেও একটা ভড়কি দেওয়া যায়।"

"কেমন ভড়কি?"

"বিকেলে আমরা একটা মিটিং ডেকে ফেলি।"

"মিটিং?"

"আরে শোন না, মিটিং মানে কি সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের জনসভা!···ধর, আজ সন্ধেবেলায় মেসের ছাদে সবাইকে আসতে বলা হল। পেন্নুর লটারির টিকিট চুরি যাবার ব্যাপারে আমরা একটা ব্যবস্থা নিতে চাই বলে সবাইকে জমায়েত হতে বলছি। মিটিংয়ে আমরা সবাই বলব, আমাদের মেসের ঠাকুর পেন্নুর লটারিতে টাকা পাবার ঘটনাটা আমরা কাগজে ছাপাতে চাই। সেই সঙ্গে একটা উকিলের নোটিশ। তাতে লেখা থাকবে, পেন্নুঠাকুরের প্রাইজ পাওয়া টিকিট, কে বা কারা চুরি করেছে। এই টিকিট যদি কেউ লটারিঅলাদের কাছে নিয়ে গিয়ে দেখায়, টাকার দাবি তোলে—তা হলে যেন পেন্নু এবং পেন্নুর উকিলকে না জানিয়ে টাকা দেওয়া না হয়।"

আনন্দ মাথা নেড়ে বলল, "মামার বাড়ি? আমি বললাম, আমার টিকিট চুরি গেছে আর লটারিঅলারা তা মেনে নিল।"

"মানতে কে বলছে! মানবে কি মানবে না—সেটা তাদের ব্যাপার। তুই আমরা যদি বলি—কাগজে উকিলের নোটিশ ছাপিয়ে জানাব, পেন্নুর চুরি-যাওয়া টিকিট জমা দিয়ে টাকা হাতানো বন্ধ করব—তাতে কাজ হবে। চান্স আছে হবার।"

*　　　　*　　　　*

পরের দিন সন্ধেবেলায়, সামান্য রাত হয়েছে হয়তে, এক ছোকরা গোছের লোক মেসে এসে হাজির। এসেই বিজনের নাম করে চেঁচাতে লাগল।

বিজন মনে মনে এরই অপেক্ষা করছিল। নীচে নেমে গেল।

"আরে, আপনি দাশুবাবু! আসুন! কী খবর?"

"খবর তো আপনার কাছেই—আসতে বলেছিলেন।"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আসুন!" বলে বিজন বড়ালবাবুর গুমখানার দিকে এগুতে লাগল।

আনন্দ যেন কাছাকাছি কোথাও ওত পেতে ছিল। হাজির হয়ে ন্যাকার মতন বিজনকে বলল, "বিজুদা, পাতিলেবুর শরবত খাবে নাকি?"

"শরবত পরে হবে, আয় এদিকে। এই ভদ্রলোককে নিয়ে বড়ালবাবুর ঘরে যাচ্ছি। আয়। সেই টিকিটের ব্যাপার···।"

আনন্দ বলল, "তাই নাকি! চলো, চলো।"

বড়ালবাবুর ঘরে এসে ঢুকল তিনজনে। বড়ালবাবু আর মানিক মিত্তির কথা বলছিলেন।

বিজন ঘরে ঢুকেই বলল, "বড়ালদা, আরে মানিকদা এখনও আছেন, ভালই হল। বড়ালদা, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি। এঁর নাম দাশুবাবু। ইনি ওই সুরেন্দ্রনাথ কলেজের কাছে একটা ছোট্ট স্টলে বসে টিকিট বেচেন লটারির। অনেক খুঁজে খুঁজে এঁকে পেয়েছি। পেন্নুর টিকিট এঁর দোকান থেকে কেনা।"

বড়ালবাবু আর মানিক মিত্তির দুজনেই যেন কেমন থ মেরে গিয়েছিলেন। দেখছিলেন দাশুকে।

দাশু বলল, "হ্যাঁ স্যার! আমার দোকানের কপাল খুলে গিয়েছে। কাল যেই না দোকানের সামনে লাল সালু কিনে খবরটা লিখে ঝুলিয়ে দিলাম সঙ্গে সঙ্গে ভিড় লেগে গেল। আজ স্যার পাক্কা একশো চল্লিশ টাকার টিকিট বেচা এই প্রথম।"

"কাল না রবিবার ছিল ?" মানিক মিত্তির বললেন।

"লটারির টিকিট বেচার আবার শনি-রবি আছে নাকি ?"

"আনন্দ, পেনুকে ডাক—" বিজন আনন্দকে বলল চোখের ইশারা করে। তারপর মুখ ঘুরিয়ে দাশুকে বলল, "আপনার কাছ থেকে যে টিকিট কেটেছিল তাকে মনে আছে ?"

"হ্যাঁ স্যার! আমরা মুখে অনেককে চিনে রাখি। রেগুলার কাস্টমার থাকে অনেকেই। শিয়ালদা লাইনের ডেলি প্যাসেঞ্জার।"

"এ তো রেগুলার কাস্টমার নয়!"

"না। আমার স্টলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল ছেলেটি। রোগা-রোগা দেখতে, কালো রঙ, সামনের দাঁত উঁচু। পাজামা ছিল পরনে। ঝাড়গ্রামে বাড়ি।"

"কেন দাঁড়িয়েছিল ?"

"ধুলোর ঝড় বাঁচাতে।"

ততক্ষণে পেনু এসে পড়েছে। আনন্দ আরও জুটিয়ে আনছে দু চারজনকে।

বিজন বলল, "পেনু, তোমার ভাগ্নে এই ভদ্রলোকের দোকান থেকে টিকিট কিনেছিল। অনেক খুঁজে খুঁজে এঁকে বাপু বার করেছি।"

দাশু পকেট থেকে বিড়ি বার করছিল। হেসে বলল, "সালু না টাঙালে বার করতে অসুবিধে হত। অবশ্য আপনি স্যার—আশেপাশের দোকানে খোঁজ করে ভালই করেছিলেন। আমার দোকান থেকে ফার্স্ট প্রাইজ উঠেছে তো—সবাই চিনে গিয়েছে। এমনিতেই চেনাশোনা অনেকেই। তবে এবার জোর টেক্কা দিলাম।"

বড়ালবাবু বললেন, "আপনি কেমন করে জানলেন আপনার দোকানের টিকিট ফাস্ট প্রাইজ পেয়েছে ?"

"বা বা, এ আবার কী বলছেন দাদু! আমার দোকানের টিকিট আমি জানব না ? টিকিটের টিকিগুলো যে আমার হাতে বাঁধা দাদু। কাগজ দেখলেই জানা যায়, আমার হাত কারও

শিকে ছিঁড়ল কি না। তারপর আমাদের প্রাইজ আছে না। এজেন্টের প্রাইজ।"

আনন্দ বলল, "কিন্তু মশাই, আপনি এখন পেন্নুকে কীভাবে সাহায্য করতে পারেন?"

"পারি।"

"পারেন?"

"চেষ্টা করতে প্যারি। উনি—" বলে দাশু বিজনের দিকে আঙ্‌ল দেখাল, "উনি বলছিলেন, টিকিটটা হারিয়ে গিয়েছে। হারানো টিকিটে প্রাইজ হয় না। তবে আমি সাক্ষী হতে পারি, আপনারাও সাক্ষী হবেন। সবাই মিলে উকিলের চিঠি দিয়ে জানাব, টিকিটের আসল মালিক টিকিট হারিয়ে ফেলেছে, নকল মালিককে যেন প্রাইজের টাকা দেওয়া না হয়। পারি কিনা বলুন স্যার আপনারা?"

হরিদা বললেন, "চিঠি নিশ্চয় দেওয়া যেতে পারে, তবে টাকা আটকে রাখা না-রাখার মালিক অথারিটি।"

বিজন বলল, "অল্ রাইট। অথারিটি তাদের নিয়ম মেনে কাজ করুক আপত্তি নেই, আমরাও আমাদের কর্তব্য করব, কী বলেন বড়ালদা! আমরা চেষ্টা করব পেন্নুর টিকিট হাতিয়ে কেউ যেন মজাসে টাকাটা না পকেটে পোরে!"

আনন্দ মাথা নাড়ল। "আমি কিন্তু একটা কথা বলব?"

"বল্!"

"তোমরা যা করতে চাইছ তাতে আমার একটা অসুবিধে হবে।"

"কেন?

আনন্দ ক' মুহূর্ত চুপ করে থাকল। তাকাল, দেখল সবাইকে। বলল, "ব্যাপারটা তা হলে বলেই ফেলি। শনিবার দিন অফিসে গিয়ে আমি পেন্নুর কথা বন্ধুবান্ধব কোলিগদের, বলেছিলাম। সবাই পেন্নুর ব্যাড লাক-এর জন্যে দুঃখ করতে লাগল। কিন্তু আজ প্রলয় সেন বলে আমাদের এক সিনিয়ার কোলিগ আমায় বললেন, তিনি একটা ব্যবস্থা করতে পেরেছেন মোটামুটি।"

আনন্দ আর বিজন চোখে চোখে তাকাল। অন্তরা আনন্দর দিকে তাকিয়ে।

আনন্দ বলল, "এই লটারিটা তো একটা ট্রাস্ট থেকে করছে—চ্যারিটেবল ট্রাস্ট। সেই ট্রাস্টের এক কর্মকর্তা হলেন প্রলয়দার মামা, মানে আমার কোলিগ প্রলয় সেনের মামা। প্রলয়দা আমাকে বললেন, তিনি মামার সঙ্গে কথা বলেছেন। আমাকে একবার নিয়ে যাবেন কাল তাঁর অফিসে। নিজের মুখে গিয়ে বুঝিয়ে সব বলতে হবে তাঁকে। এর মধ্যে তিনি হুকুম করে দিয়েছেন, টাকা কেউ তুলতে পারবে না, মানে ফাস্ট প্রাইজ!"

বিজন বলল, "আমরাও তো তাই চাই। তা হলে আর…"

"না না." আনন্দ বলল, "তোমরা যদি উকিল-আদালত কর তা হলে মুশকিল হবে—চোর আর ধরা পড়বে না।"

"কেন?"

"সে পিছিয়ে যাবে।…কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি যে-পথে এগুচ্ছিলাম সেই পথে এগুলে চোর হাতেনাতে ধরা পড়ত।"

"কেমন করে?"

"আরে সেহ ব্যবস্থাই তো হচ্ছিল। প্রলয়দার মামা চাইছেন, হাতেনাতে চোর ধরা পড়ুক। অফিসে তাঁর হুকুম ছিল, যে-লোকই ফাস্ট প্রাইজের জন্যে টিকিট দেখাতে আসেন—সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরো।"

"ধরো?"

"হ্যাঁ, ধরে রাখো। খবর দাও প্রলয়দার মামাকে। এরপর যা করার তাঁরাই করবেন। তবে তোমার মেসের অনেকের সাক্ষি লাগবে। পেন্নুর তো অবশ্যই। চাই কি আমরা দাশুবাবুকেও কাজে লাগাতে পারি।"

বিজন তারিফ করে বলল, "তুই যা করেছিস আনন্দ, ভালই করেছিস। আমরা তা হলে উকিলের কাছে যাব না এখন!"

"দরকার নেই। টাকা হাতানো বন্ধ করাই আসল কাজ। সেটা যখন হয়ে যাচ্ছে…"

হরিবাবু বললেন, "ঠিক, ঠিক কথা। চোর যদি টাকাই না পেল তবে তার চুরি করাই বৃথা হল।"

মানিকবাবু এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন, এবার হালকা গলায় বললেন, "পেন্নুর ভাগ্যটাই খারাপ, হাতে পেয়েও দেড় লাখ টাকা হারাল।"

বড়ালবাবু কথা বললেন না।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়া সেরে বিজন খোলা ছাদে পায়চারি করতে উঠেছিল। রোজই সে এ-সময় খানিকক্ষণ পায়চারি করে। তার অভ্যেস।

বিজন ছাদে উঠতেই দেখল, গানের মাস্টার। গানের মাস্টার জলের ট্যাংকের সামনে থেকে সরে এল। দেখল বিজনকে তারপর তাড়াতাড়ি ছাদ থেকে নেমে যাবার জন্যে সিঁড়ির কাছে এগিয়ে এল।

বিজনের মনে হল, গানের মাস্টার যেন রীতিমতন ঘাবড়ে গিয়েছে, পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সামনে থেকে।

বিজন সিঁড়ি আটকে দাঁড়াল। "কী ব্যাপার? আপনি?"

"এমনি," গানের মাস্টার বলল।

"হাওয়া খেতে?" বিজন ঠাট্টা করে বলল।

"হ্যাঁ। আপনিও তো হাওয়া খেতে আসছেন।"

বিজন বুঝতে পারল, মাস্টার তাকে ঠুকল। মেসের ছাদ, যার খুশি আসতে পারে, পায়চারি করতে পারে।

গানের মাস্টার পাশ কাটিয়ে নেমে গেল।

বিজন দাঁড়িয়ে থাকল সামান্য। বুঝতে পারছিল না ব্যাপারটা। তার সন্দেহ হচ্ছিল গানের মাস্টার এ-সময় ছাদে উঠে আসবে কেন? ছাদে পায়চারি করা তার অভ্যেস নয়। কী করছিল ও গঙ্গাজলের পুরনো ট্যাংকের কাছে?

বিজন কেমন সন্দিগ্ধ হয়ে গঙ্গাজলের ভাঙাচোরা ট্যাংকের কাছে এসে দাঁড়াল। দেখতে লাগল চারপাশ! কিছুই নেই। তবে?

হঠাৎ নজরে পড়ল ট্যাংকের ওপর একপাশে কাগজের ছোট্ট

একটা টুকরো। হাত বাড়িয়ে টেনে নিল টুকরোটা। কুচিয়ে একেবারে টুকরো টুকরো করা কাগজের একটা অংশ। বোঝা মুশকিল। অন্ধকারে কিছুই ঠাওরা করা যায় না। পকেট থেকে দেশলাই বার করে বিজন ট্যাংকের আড়ালে বসল। বাতাসে দেশলাইকাটি নিবে না যায় যেন। কাগজের টুকরোটা দেখল। টিকিটেরই টুকরো।

গানের মাস্টার তাহলে কি টিকিট ছিঁড়তে ছাদে এসে উঠেছিল? কিন্তু এত জায়গা থাকতে ছাদ কেন? টিকিট তো যেখানে-সেখানে ছিঁড়ে বাতাসে উড়িয়ে দেওয়া যেত!

বিজনের মাথায় কিছু ঢুকছিল না।

পুরনো ভাঙাচোরা জলের ট্যাংকের দিকে তাকিয়ে বিজন যেন কোনো ধাঁধার জবাব খোঁজবার চেষ্টা করছিল। আরও ঝুঁকে পড়ল ট্যাংকের ওপর। হাত বোলাতে লাগল ধীরে ধীরে। আর হঠাৎ তার আঙুলে কিসের যেন ছোঁয়া লাগল। কী? আঙুল টানতেই সুতোর মতন কী একটা উঠে আসতে লাগল। তার পরই বিজন তাজ্জব।

অদ্ভুত ব্যাপার তো! একটা হাত দেড়-দুই লম্বা টোন সুতোর মাথার দিকটা জলের ট্যাংকের ফাটাফুটির সঙ্গে একজায়গায় বাঁধা আর সুতোর তলার দিকে অন্য কী যেন বাঁধা। ট্যাংকের মুখের গর্তের মধ্যে সুতোটা ঝুলছিল।

ছাদে বেশ অন্ধকার। ভাল করে দেখা বা বোঝা যায় না। বিজন সুতো সমেত জিনিসটা টেনে নিয়ে নীচে নেমে গেল।

হরিবাবু তখনও শুয়ে পরে পড়েননি, শোবার তোড়জোড় করছিলেন।

বিজন হাতের বস্তুটা আলোয় ভাল করে দেখল। একেবারে ছেলেমানুষি ব্যাপার। টোন সুতোর যে দিকটা ট্যাংকের মধ্যে ঝুলছিল সেই দিকটায় একটা দেশলাইয়ের খাপ প্লাস্টিকের টুকরো দিয়ে জড়ানো; সুতোয় সেটা বাঁধা ছিল। মানে কেউ সুতোয় দেশলাইয়ের খাপটা বেঁধে ট্যাংকের গর্তের মধ্যে ঝুলিয়ে রেখেছিল।

"হরিদা ?"

"বলো।"

এই দেখুন। এটা ছাদের ওপর জলের ট্যাংকের মধ্যে ছিল। ঝুলিয়ে রেখেছিল রেখেছিল কেউ।"

হরিবাবু দেখলেন। বললেন, "দেশলাইয়ের বাক্সটা তো খালি। অথচ অত যত্ন করে রাখা···।"

"আমি বুঝতে পেরে গিয়েছি," বিজন বলল, "ওই দেশলাইয়ের খাপের মধ্যে পেন্নুর লটারির টিকিটটা কেউ রেখেছিল। পাছে নিজের কাছে কোথাও রাখলে চুরি যায়, বা সার্চ হলে ধরা পড়ে যায়—তাই জলের শুকনো ট্যাংকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছিল ?"

হরিবাবু বললেন, "বলো কী ? পাকা চোর তো !···তা টিকিটটা কোথায় ?"

"টিকিটটা আজই ছিঁড়ে ফেলেছে। খানিকটা আগে।"

"কেন, কেন ?"

"ধরা পড়ার ভয়ে। ওই যে আমরা বললাম, টিকিটটা দেখিয়ে টাকা চাইতে গেলেই ধরা পড়ে যাবে চোর—সেই ভয়ে টিকিটটা নষ্ট করে ফেলেছে।"

"সে কী। দেড় লাখ টাকা এইভাবে নষ্ট করল। পেন্নু বেচারির কপালে টাকটা সইল না বিজন।"

"হ্যাঁ। যে চুরি করেছিল সে দেখল, টাকাটা আর সে পাবে না; আবার পেন্নুকেও এখন ফেরত দিতে যাওয়া মুশকিল—ধরা পড়ে যেতে পারে। তাই নষ্ট করে ফেলল।"

"চোরটা কে ?"

"গানের মাস্টার। তবে গানের মাস্টারের সঙ্গে বোধহয় বড়ালবাবুর সাঁট ছিল।"

"কেমন করে বুঝলে ?

"দেশলাই দেখে," বিজন হাসল, "এই দেশলাইটা দেখুন। বড়ালবাবু ছাড়া এই দেশলাই কেউ ব্যবহার করে না। এ হল খাদি-

দেশলাই। একেবারে আলাদা দেখতে। বড়ালবাবু এই দেশলাই মাগনা পান, তাঁকে দিয়ে যায় তাঁর এক পুরনো দোস্ত। খাদিতে কাজ করেন।"

হরিবাবু বোকার মতন বললেন, "তা হলে?"

"তা হলে আর কী! চোর ধরা পড়েও বেঁচে গেল। টিকিটই যখন নেই, তখন আর মামলা চালিয়ে লাভ হবে না।"

হরিবাবু বড় করে নিশ্বাস ফেললেন। বললেন, "বড়াল যে পেনুর টাকা মারার চেষ্টা করবে—ভাবিনী। মানুষটার এত লোভ! ছি ছি!"

বিজন বলল, "আমার কিন্তু বড়ালবাবুকে কোনোদিনই সাধু-পুরুষ মনে হয়নি। লোকটা বেশ বাজে।"

বিজন আনন্দকে ডাকতে গেল। খবরটা দেওয়া দরকার।

□

□ একদিন এক গোলাপ বাগানে □

সামনে বড়দিন। অফিস থেকে বেরিয়ে অনিল ভাবছিল, এক-বার নিউ মার্কেটের দিকে যাবে। তার একটা প্যান্ট পড়ে আছে মাসুদ দরজির কাছে। যদি প্যান্টটা পাওয়া যায় ভাল। না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই, এই বড়দিনের সময় নিউ মার্কেটের চেহারা ফিরে যায়। কী সাজগোজ, কত মানুষজন, খানিকটা সময় বেশ কাটিয়ে দেওয়া যাবে ঘোরাঘুরি করে।

অনিল পা বাড়াতে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখল, গোরা আসছে। হন্তদন্ত হয়েই আসছে যেন।

গোরা কাছে এল। বলল, "বেরিয়ে পড়েছিস? আর একটু হলেই তোর দেখা পেতাম না। আবার বাড়ি ছুটতে হত। কোথায় যাচ্ছিস? বাড়ি?"

"না। ভাবছিলাম একবার নিউ মার্কেটের দিকে যাব।"

"খুব খারাপ খবর আছে।"

অনিল তাকাল। "খারাপ খবর?"

"মতিকাকা পাগল হয়ে গিয়েছেন।" অনিল যেন প্রথমটায় খেয়াল করতে পারেনি, পরমুহূর্তে তার খেয়াল হল। বিশ্বাস করতে পারল না। "যাঃ!"

গোরা বলল, 'খানিকটা আগে আমি খবর পেয়েছি। তোকে জানাতে এলুম।"

অনিল তখনও বিশ্বাস করতে পারছিল না। অবাক হয়ে গোরাকে দেখছিল। দুঃসংবাদ মিথ্যে হয় না। তবু অনিল বলল, "তুই ঠিক বলছিস?"

"জুড়ন কলকাতায় এসেছে। খবরটা দিতেই এসেছে। আমাদের একবার যেতে হবে।

"কোথায়?"

"মতিকাকার গোলাপবাগানে।"

"সে তো মধুপুরের কাছে!"

"হ্যাঁ। ওখানেই যেতে হবে। মিস্টিরিয়াস ব্যাপার। চল্, তোকে সব বলছি।"

অনিলের অফিস ওয়েলিংটন স্কোয়ারের কাছে। ধর্মতলার মুখ পর্যন্ত এগিয়ে গেলেই চায়ের দোকান। অনিলের আসা-যাওয়া আছে দোকানে। সামান্য পথ হেঁটে এসে চায়ের দোকানে বসল দু'জনে। অফিস ছুটির ভিড়। নিরিবিলি বসার জায়গা পাওয়া মুশকিল। তবু দোকানের এক ছোকরা পেছন দিকে একটা জায়গায় বসিয়ে দিল দু'জনকে।

অনিল চায়ের কথা বলল।

গোরা জল চাইল এক গ্লাস। তাকে খানিকটা বিচলিত দেখাচ্ছিল।

অনিল তখনও ধাঁধার মধ্যে রয়েছে। মতিকাকা তার নিজের কাকা নয়, গোরার কাকা। গোরার বাবার খুড়তুতো ভাই। অনিল গোরার বন্ধু। দূর সম্পর্কের আত্মীয়তাও রয়েছে দুই বন্ধুর মধ্যে। নিজের না হলেও মতিকাকাকে বরাবর কাকার মতনই ভক্তিশ্রদ্ধা করেছে অনিল। মানুষটি বড় ভাল। অনিলদের খুবই স্নেহ করেন। সেই মতিকাকা হঠাৎ পাগল হয়ে গিয়েছেন ভাবতে অনিলের খারাপ লাগছিল।

গোরা নিজেকে সামলে নিল। জল খেয়ে বড় করে নিশ্বাস ফেলল। তারপর বলল, "জুড়নের কাছে আমি যা শুনলাম, তোকে বলছি।"

"বল।"

"তুই তো জানিস, মতিকাকা ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে কাজকর্ম করেন। খাওয়া, শোওয়া, বসা—সবই নিয়মে।"

অনিল ঘাড় নাড়ল। সে মতিকাকার স্বভাব জানে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত যা যা করেন মতিকাকা সব যেন রুটিন-মাফিক।

এত নিয়ম মেনে কাজ করলে মানুষকে একটু খেপাটে মনে হয়। তা বলে মতিকাকাকে খেপা বলা যাবে না। বড়জোর বলা যেতে পারে, অনেক ব্যাপারে কাকা খেয়ালি, কোনো-কোনো ব্যাপারে জেদি, আবার দু'চারটে বিষয়ে অবুঝ। মানুষটা যদি খেয়ালি আর অবুঝ। মানুষটা যদি খেয়ালি আর অবুঝ না হবেন—কলকাতার ঘর-বাড়ি, ভাল চাকরি ছেড়ে গোলাপবাগান করতে মধুপুরের দিকে ছুটে যান!

গোরা বলল, "ঘটনাটা ঘটেছে দিন তিন-চার আগে। ঠিক-ঠিক বললে, গত মঙ্গলবার—মানে উনিশ তারিখ বিকেলে।"

"উনিশ!...আজ বাইশ। হ্যাঁ, চার দিনই।"

"সকাল বা দুপুরে কাকার মধ্যে কোনো অস্বাভাবিকতা দেখা যায়নি। রোজ যেমন সাতসকালে ঘুম থেকে ওঠেন, তেমনই উঠেছেন। মুখ ধুয়ে চা খেয়ে গরম জামাকাপড় পরে হাঁটতে বেরিয়ে গিয়েছেন। তারপর রোজই পর-পর যেভাবে যা-যা করেন, সবই করেছেন। দুপুরেও কিছু বোঝা যায়নি। বিকেলে মতি কাকা গোবিন্দ মালীর সঙ্গে গোলাপবাগানের দেখাশোনা করছিলেন। দেখাশোনা করার সময় হঠাৎ মতিকাকার কী যেন হয়ে যায়! ভীষণ ভাবে চিৎকার করে ওঠেন কাকা। গোবিন্দ কিছুই বুঝতে পারেনি। সে কাকার চিৎকার শুনে ছুটে আসে। কাকাকে যেন সাপে কামড়েছে এইভাবে ফুলগাছের দিকে তাকিয়ে কাকা কেমন ভয়ে নীল হয়ে যেতে লাগলেন, কাঁপতে লাগলেন! তারপর অজ্ঞান হয়ে বাগানে পড়ে গেলেন।"

অনিল অবিশ্বাসের গলা করে বলল, "বলিস কী?"

"আমি তো চোখে দেখিনি, যা বলেছে জুড়ন, তাই বলছি।"

"তারপর?"

"তারপর গোবিন্দর হাঁকডাক শুনে অন্যরা ছুটে আসে। কাকাকে বাড়ির মধ্যে নিয়ে গিয়ে শুইয়ে দেওয়া হয়।"

"ডাক্তার?"

"ওই বনবাদাড়ে ডাক্তার কোথায়? খানিকটা তফাতে এক বুড়ো ভদ্রলোক থাকেন-দেখেছিস তো পুলিনবাবুকে। কবিরাজি হোমিওপ্যাথি—দুই-ই করেন। দেহাতের লোক তাঁর ওষুধ খায়। সেই পুলিনবাবুকে ডেকে আনা হয়। তিনি বললেন, মৃগী। ভয় নেই। বলে কিছু হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন। ওষুধে কাজ কিছুই হল না। পরের দিন সকাল থেকে মতিকাক পাগলের মতন কথাবার্তা বলতে লাগলেন।"

চা-টোস্ট এসেছিল।

চায়ে চুমুক দিয়ে অনিল বলল, "পাগলের মতন কথাবার্তা মানে?"

"মানে পাগলরা যেমন বলে, কোনো কথার সঙ্গে পরের কথার মিল নেই।"

"যেমন?"

"আমি অত বলতে পারব না। নিজেরা গিয়ে দেখলে-শুনলে বুঝতে পারব। তবে জুড়নের কথা থেকে মনে হল, মতিকাকা হ্যালুসিনেশান দেখছেন।"

"হ্যালুসিনেশান?" অনিল কেমন থতমত খাবার মতন করে বলল।

"হ্যাঁ। আমরা বাংলায় কী বলব হ্যালুসিনেশনকে? ভ্রম, না মতিভ্রম?

"কী জানি। শুনেছি, হ্যালুসিনেশনে লোকে উদ্ভট জিনিস ভাবে আর দেখে।

গোরা বলল, "কাকাও শুনলাম উদ্ভট কথাবার্তা বলছেন।"

অনিল চা খেতে লাগল। কৌতূহল কম হচ্ছিল না তার। বলল, "দু-একটা শুনি। জুড়ন বলেনি?"

মাথা হেলাল গোরা। বলল, "বলেছে। গোলাপবাগান তছ-নছ করে দিতে বলছেন কাকা। কখনও বলছেন, বাগানে আগুন লাগিয়ে দাও; কখনও বলছেন, গাছগুলো উপড়ে মাটি খুঁড়ে

ফেলো ; কখনও আবার বলছেন, বাগানে কেউ যেও না, ওই বাগান মরণ-ফাঁদ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে··· ।"

অনিল বলল, "পাগলামি !"

"পুরো। কিন্তু কেন ? একজন সুস্থ-সবল মানুষ—আচমকা পাগল হবেন কেন ? কী আছে বাগানে ?"

"বাগানে কিছু নেই। কাকা আজ সাত আট বছর ধরে ওই বাগান নিয়ে আছেন। এতকাল যদি বাগানে ভয়ের কিছু না থেকে থাকে—হঠাৎ সেই বাগানে ভয়ের ব্যাপার কী ঘটতে পারে ?"

গোরা ঘাড় দোলাল। "আমার তাই মনে হয়।···তা নিজেরা একবার ওখানে না গেলে বুঝতে পারছি না। কাকাকে দেখা দরকার। তুই কাল যেতে পারবি না ? আমার সঙ্গে চল্। আমি কালকেই যাব ভাবছি। তোর কাছে এসেছি তোকে সঙ্গে নিয়ে যাব বলে।"

অনিল একটু ভাবল। বলল, "অসুবিধে নেই। কালই যেতে পারব। অফিসে বলে নেব একবার। ক্রিসমাসের ছুটি আছে দু' একদিন। ওরই সঙ্গে আরও দু' চার দিন জুড়ে নেব।"

"বাঁচালি ভাই। একলা যেতে ভয় করছিল।"

* * *

রাত দশটার গাড়ি। প্যাসেঞ্জার ট্রেন। ভিড় ভয়ংকর না হোক, ভালই বলতে হবে। শীতও পড়েছে জাঁকিয়ে।

অনিলরা ভাগ্যবান। এমন একটা কামরায় উঠল, যে-কামরায় শোবার জায়গা পাওয়া গেল। আসলে কামরাটায় একটিমাত্র আলো জ্বলছে, বাকি আলো খারাপ। অন্ধকার কামরায় অনেকেই উঠতে রাজি হয়নি। প্যাসেঞ্জার ট্রেনে এমনিতেই চুরিচামারি বেশি হয় ; পায়ে-পায়ে গাড়ি থামে, যাত্রী ওঠানামা করে, কে কখন কার জিনিস নিয়ে নেমে পড়বে খেয়াল রাখা যায় না। এরপর যদি অন্ধকার কামরা হয়, চোরদের আরও সুবিধে।

অনিলদের লটবহর নেই, চুরি যাবার মতনও কিছু ছিল না তাদের কাছে। মামুলি দুটো কিট্-ব্যাগ, আর একটা করে কম্বল কিট্-ব্যাগ মাথায় দিয়ে জুতোজোড়া মাথার কাছে রেখে দুই বন্ধু বাংকের ওপর শুয়ে পড়ল।

ট্রেন ছাড়ার খানিকটা পরেই বোঝা গেল শীত কাকে বলে। ডিসেম্বরের শেষ প্রায়, লিলুয়া পেরুতেই পৌষের দাপটটা বোঝা যাচ্ছিল।

গোরা বলল, "দুটো মাংকি ক্যাপ নিয়ে এলে হত রে, অনিল কানের মধ্যে দিয়ে শীত ঢুকে যাচ্ছে।"

অনিল বলল, "মাফলার জড়িয়ে নে মাথায়।"

"তুই নিয়েছিস ?"

"হ্যাঁ"

কিছুক্ষণ দুই বন্ধু কথাবার্তা বলল, সাধারণ কথা। কামরায় লোক কম। গাড়ি ছাড়ার পর খানিকক্ষণ প্রায় সবাই নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছিল। তারপর ধীরে ধীরে চুপ করে গেল প্রত্যেকটি স্টেশনে গাড়ি থামলেও যাত্রীদের ওঠানামা তেমন নেই। অন্ধকার কামরা বলেই বোধহয় ওঠার যাত্রী পাওয়া যাচ্ছিল না।

দেখতে-দেখতে রাত বাড়ল। গাড়ি শ্রীরামপুর ছাড়িয়ে গিয়েছে।

গোরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। তার সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। অনিল ঘুমোয়নি। ট্রেনে সহজে তার ঘুম আসতে চায় না।

অনিল চোখ বন্ধ করে শুয়ে-শুয়ে মতিকাকার কথা ভাবছিল। গতকাল থেকেই ভাবছে অবশ্য, কিছুই বুঝতে পারছে না।

মতিকাকার ষোলো আনা কথা অনিল হয়তো জানে না, তবে আট-দশ আনা জানে বইকী। মতিকাকার পুরো নাম মতিলাল দত্ত। লোকে ছোট করে বলে মতি দত্ত।

মতিকাকাদের বাড়ি বরানগরে। দুই পুরুষের বাড়ি। বনেদি পরিবার। মতিকাকারা দুই ভাই। বাড়ির দুই অংশ। এক অংশ

মতিকাকার, অন্য অংশ মতিকাকার দাদার। ভাইয়ে-ভাইয়ে অমিল ছিল না। তবু মতিকাকা একদিন হুট করে তাঁর অংশ বেচে দিয়ে কলকাতা ছেড়ে চলে গেলেন।

এক-একজন মানুষ থাকে, যারা বড় খামখেয়ালি হয়। মতিকাকাকে বোধহয় সেই দলে ফেলা চলে। নামকরা কম্পানির কেমিস্টের ভাল চাকরি আর বরানগরের বাড়ি বেচে দিয়ে কোন্ বুদ্ধিমান মধুপুরের দিকে চলে যায়! মতিকাকার দাদা নাকি বলেন, বিয়ে-থা করেনি, কোনো দায়-দায়িত্ব নেই, সংসার নেই—তাই মতি এ-সব খামখেয়ালি কাণ্ড করল। একদিন বুঝতে পারবে। আরও বয়েস হোক, তখন বুঝবে নিজের পায়ে কুড়ুল মারা কাকে বলে।

মতিকাকার বয়েস এখন মোটামুটি সাতচল্লিশ। তা প্রায় বছর ছয়-সাত হবে মতিকাকা কলকাতা-ছাড়া। বছরে এক-আধবার কলকাতায় আসেন অবশ্য, দাদার কাছেই ওঠেন, তবে হপ্তাখানেকের বেশি থাকেন না।

কেন যে একটা মানুষ সব ছেড়েছুড়ে বাইরে গিয়ে গোলাপ-বাগান নিয়ে মাতলেন, তা এমনিতেই রহস্যময়। তবে সাদামাটা ভাবে বলতে গেলে বলতে হয়, মতিকাকা এক ধরনের হাঁপানিতে ভুগছিলেন। সাধারণ হাঁপানির সঙ্গে এর খানিকটা তফাত আছে। অনিলরা অন্তত তেমনই শুনেছে। শুনেছে, জন্মকাল থেকেই কাকার কেমন একটা খুঁত রয়েছে বুকে, তার ফলে অনেক জিনিসই তাঁর সহ্য হয় না, বুকের এবং শ্বাসপ্রশ্বাসের কষ্ট হয়। স্যাঁসেঁতে আবহাওয়া, ধুলো-ধোঁয়া, ভিড়, উত্তেজনা, উদ্বেগ—আরও অনেক কিছু থেকে তাঁকে এড়িয়ে থাকতে বলা হয়েছিল। মতিকাকা নাকি সেইজন্যই কলকাতা ছেড়ে চলে গেছেন।

অনিল অতশত বোঝে না, তবে এটুকু বলতে পারে, নিজের মনোমতন জায়গা বেছে নিয়ে, সেখানে এক মস্ত গোলাপবাগান করে মতিকাকা ভালই আছেন।

মাঝেসাঝে অনিলরা মতিকাকার কাছে বেড়াতে যায়। এই

তো গরমে গিয়েছিল একবার। দিন তিনেক ছিল। অনিলদেরও জায়গাটা বেশ পছন্দ। বিঘে দু'আড়াই জমি, চারদিকে কম্পাউণ্ড ওয়াল, বিঘে দেড়েকের মতন জায়গা নিয়ে গোলাপবাগান। অবশ্য গোলাপবাগান বলতে শুধু গোলাপই নয়, অন্য ফুলের গাছও আছে, তবে গোলাপই বেশি। এই বাগানের দেখাশোনা করে মালী আর মতিকাকারা ক'জন। দু' দুটো কুয়ো আছে বাগানে। গরমকালে জলের খানিকটা টানাটানি থাকে বলে দুটো কুয়োর ব্যবস্থা। কাকা থাকেন বাগানের লাগোয়া কটেজে। কটেজের গাঁথুনি ইঁট আর চুনসুরকির, মাথার ছাদ খাপরার। কটেজের চেহারাটা ছোট স্কুল কিংবা মফস্বলের হাসপাতাল-বাড়ির মতন। গোটা তিনেক ঘর। বড় ঘরে থাকেন কাকা। অন্য ঘরে জুড়ন আর অমর। একটা ঘর ফাঁকাই পড়ে থাকে। রান্নাঘর ভাঁড়ারঘর আলাদা। কেশব ঠাকুর রান্নাবান্না করে। মালীর থাকার ব্যবস্থা নার্সারিঘরের পাশে।

মতিকাকার গোলাপবাগানের ব্যবসা সামলায় অমর। জুড়ন করে ছোটাছুটি। কাকার গোলাপের চাহিদা আছে। কাছাকাছি শহরে যত না চালান যায় গোলাপ, তার চেয়ে বেশি যায় পাটনায়। কলকাতাতেও চালান আসে। নিউ মার্কেটের পিয়ারিলাল কাকার গোলাপ নেয়।

সত্যি বলতে কী, গোলাপবাগানের আয়ে মতিকাকার অতগুলো পুষ্যির খাওয়া-পরা চলে না। ধানের জমিও কাকাকে খানিকটা রাখতে হয়েছে। তবে সাদামাটা খাওয়া-দাওয়া, বাড়তি খরচ বলে কিছু নেই, যা আয় হয়, তাতে চলে যাবারই কথা।

গোলাপবাগান আগলে আর নিরিবিলিতে জীবন কাটাবেন স্থির করে নিয়ে কাকা তো ভালই কাটাচ্ছিলেন দিনগুলো, হঠাৎ পাগল হয়ে গেলেন কেন?

*   *   *

মধুপুরের আগেই নামতে হয়। গাড়ি পৌঁছল আটটা নাগাদ। রোদে টলটল করছে শীতের সকাল।

স্টেশনের বাইরে এসে অনিল বলল, "জুড়নকে তুই বলিসনি আমরা কখন আসব ?"

"আসব বলেছিলাম। কবে কখন, বলিনি। ঠিক ছিল না।"

"তা হলে চল হাঁটি। মাইলটাক পথ। রোদে আরাম লাগবে।"

গোলাপবাগানের একটা সাইকেল-রিকশা আছে। নিজেদের কাজেকর্মে সেটা চালানো হয়। গোবিন্দ মালী চালায়। এ-ছাড়া সাইকেলও আছে একটা। জুড়নের জানা ছিল না গোরারা কখন আসছে, সাইকেল-রিকশা পাঠায়নি।

দুই বন্ধু হাঁটতে লাগল। কাঁধে কম্বল, হাতে কিট-ব্যাগ। এই জমজমাট শীতে চারদিক বড় সুন্দর দেখাচ্ছিল। রাস্তা কাঁচা, মেঠো পথই বলা যায়। রাস্তায় দু'পাশেই মাঠ, গাছপালা, পরপর কত দেবদারু গাছ, কুল আর আতাঝোপেরও অভাব নেই। ছোট-ছোট খেতি দু'পাঁচটা। কপি কড়াইশুঁটি টমাটোর সবজিবাগান।

হাঁটতে-হাঁটতে গোরা বলল, "আমার বড় ভয় করছে রে!"

ভয় না হোক, কেমন এক অস্বস্তি অনিলেরও করছিল। গোলাপবাগানে গিয়ে মতিকাকাকে কেমন দেখবে কে জানে! অনিল বলল, "ভয় করে আর কী হবে! চল দেখি—অবস্থা কেমন ?"

গোরা বলল, "কাল গাড়িতে ঘুমোতেও পারিনি। একবার করে ঘুম আসছে আর অদ্ভুত-অদ্ভুত স্বপ্ন দেখছি। ভয়ের স্বপ্ন।"

অনিল ঠাট্টা করে বলল, "বাজে বকিস না। টেনে ঘুম মারলি সারারাত।"

গোরা প্রতিবাদ করে বলল, "চুপ করে শুয়ে থাকলেই ঘুম হয়!"

অনিল কিছু বলল না।

খানিকটা পরে গোরা আবার বলল, "আমি ভাবছি, কাকার যদি বাড়াবাড়ি অবস্থা দেখি, তা হলে কী করব ? কলকাতায় নিয়ে যেতে হবে ট্রিটমেন্টের জন্যে। এখানে ফেলে রাখার কোনো মানেই হয় না।

"তুই কী বলিস ?"

অনিল বলল, "মতিকাকার দাদাকে খবর দেওয়া হয়নি ?"

"জুড়ন দিয়েছিল। ওদের বাড়িতে অসুখ-বিসুখ চলছে। কী বলেছে আমি জানি না।"

"ঠিক আছে। অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করতে হবে।"

আরও খানিকটা এগিয়ে দূরে গোলাপবাগান দেখা গেল। গোরা বলল, "ওই যে ! আমার ভাই বুক-ধড়ফড় শুরু হয়ে গেছে।"

"তুই বড় নার্ভাস।"

গোলাপবাগানের ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে অনিলেরও যেন ভয়-ভয় লাগল। সুস্থ সবল প্রাণখোলা মানুষকে কেমন দেখবে কে জানে।

ফটক খুলে পা বাড়াতেই মালীকে চোখে পড়ল। কুয়োতলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। গোবিন্দ মালী তাদের দেখতে পেল।

বাগানের রাস্তা দিয়ে দু'জনে যেন অস্বস্তির সঙ্গে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে লাগল। একেবারে চুপচাপ সব। পাখির ডাক ছাড়া কোনো শব্দ নেই। মতিকাকার গোলাপবাগান এত নিঝুম থাকে না।

আরও কয়েক পা এগুতেই মতিকাকাকে চোখে পড়ল। বাড়ির বারান্দায় রোদের মধ্যে বসে আছেন।

গোরা বলল, "ওই তো কাকা বসে আছেন।"

অনিল বলল, "আমাদের দেখতে পেয়েছেন।"

অস্বস্তি আর ভয়ের সঙ্গে এগিয়ে গেল দু'জনে। বারান্দার গায়ে এসে দাঁড়াল।

মতিলাল দু'জনকে দেখলেন। "তোমরা ?"

অনিলরা মতিকাকাকে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। দাড়ি কামানো হয়নি, মাথার চুল উশকো-খুশকো, কপালটা কালো দেখাচ্ছিল। অসুস্থ মানুষকে যেমন দেখায়, সেই রকমই দেখাচ্ছিল কাকাকে, পাগল বলে মনে হচ্ছিল না।

গোরা বলল, "বড়দিনের ছুটি আছে তিন-চার দিন। চলে এলাম।"

"এসো" মুখে বললেন মতিলাল, কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি সন্দিগ্ধ।

অনিল আর গোরা লক্ষ করল, অন্য সময় যখনই তারা এসেছে মতিকাকার কাছে, তাঁর অভ্যর্থনার ধরনই ছিল আলাদা। চেঁচিয়ে হেসে দু'হাতে টেনে নিয়ে, হইচই করে তিনি তাদের অভ্যর্থনা করতেন। আর আজ যেন একেবারে ঠাণ্ডাভাবে 'এসো' বললেন।

গোরা বলল, "জুড়ন কলকাতায় গিয়েছিল।"

"জানি," মতিলাল কথা শেষ করতে দিলেন না অনিলকে। "জুড়ন তোমাকে খবর দিয়ে এসেছে। বরানগরেও গিয়েছিল।"

গোরা চুপ।

"তোমরা আমায় দেখতে এসেছ," মতিলাল বললেন, "আমি জানতাম তোমরা আসবে।" বলে অনিলের দিকে তাকালেন, তারপর আচমকা বললেন, "কেমন দেখছ আমাকে?"

অনিল বোবা। কী বলবে সে?

মতিলাল সামান্য অপেক্ষা করলেন, "কী হে অনিল? কথা বলছ না?"

অনিল ঢোঁক গিলে বলল, "না, মানে···এমনিতে ঠিকই দেখাচ্ছে। তবে মনে হচ্ছে আপনার শরীরটা ভাল নয়।"

"ভাল নেই।···তা আমাকে কী পাগল মনে হচ্ছে?"

অনিল মাথা নাড়ল। পাগলের কোনো লক্ষণ সে দেখছে না।

"এরা আমায় পাগল ভাবছে," মতিলাল বললেন, "আমার সামনে চুপ করে থাকলেও ওদের কথাবার্তা কাজ থেকে আমি বুঝতে পারছি—আমার পোষ্যরা আমায় পাগল ভাবছে।"

গোরা মাথা নাড়ল। "আপনার নাকি দিন-কয়েক আগে বাগানে কাজ করতে করতে হঠাৎ শরীর খারাপ হয়ে পড়ে?"

মতিলাল ঘাড় নাড়লেন। "হ্যাঁ। কথাটা ঠিকই। কিন্তু কী হয়েছিল তা তোমরা জানো না। এরাও ভাল করে জানে না। ···যাক্, সে-কথা পরে শুনো। আগে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খাও, চা

খাও—তারপর বলব।···একটা কথা শুধ্ বলি—আমার এই সাধের গোলাপবাগান এখন আর সেফ্ নয়।"

*　　　　*　　　　*

অনিলরা ট্রেনের জামাপ্যান্ট বদলে হাতমুখ ধুয়ে নিল। চা-জলখাবার শেষ করে মতিকাকার কাছে গিয়ে বসল। ভাবল, কাকার মুখে সব শোনা যাবে। জুড়ন কী বলেছে না বলেছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

মতিলাল কিন্তু নিজের কথা বলছিলেন না। কলকাতার খবরাখবর নিলেন দু'চার কথায়, অন্য পাঁচটা কথা বললেন, নিজের ব্যাপারে কথাই তুললেন না।

অনিল বুঝতে পারছিল না, মতিকাকা এমন চুপচাপ, বিমর্ষ হয়ে কী ভাবছেন! কেন তিনি আসল কথা তুলছেন না।

গোরার সঙ্গে চোখে-চোখে কথা হল। শেষে অনিল বলল, "আপনার কী হয়েছিল?"

মতিলাল কথাটা শুনলেন, কোনো জবাব দিলেন না।

গোরা বলল, "আপনি বাগানে কাজ করতে-করতে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন?"

মতিলাল গোরার দিকে তাকালেন। বললেন, "তোমরা আর কী শুনেছ?"

অপ্রস্তুত হল গোরা। মতিকাকা কখনও এমন গম্ভীর থাকেন না; কথাও বলেন না এ-ভাবে। উনি যেন অসন্তুষ্ট।

মাথা চুলকে গোরা বলল, "জুড়ন যা বলেছে, আমরা তাই শুনেছি, অনিল শুধু শুনেছে আপনার শরীর খারাপ।"

"জুড়ন কী বলেছে?"

গোরা ইতস্তত করে বলল, "জুড়ন বলছিল, আপনি বিকেলের দিকে বাগানে কাজ করতে-করতে হঠাৎ ভীষণভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন। তারপর অজ্ঞান হয়ে যান। ওরা আপনাকে ধরাধরি করে ঘরে এনে বিছানায় শুইয়ে দেয়। পুলিনবাবু আপনাকে দেখেছেন। তিনি বলেছেন, মৃগী রোগ।"

"মৃগী রোগ আমার কস্মিনকালেও ছিল না। এই বয়সে হঠাৎ মৃগী রোগ হবে? পুলিনবাবু কিছু জানেন না।"

অনিল বলল, "আমরা ভেবেছিলাম, হার্ট বা মাথা, মানে ব্লাডপ্রেশার থেকে কিছু হতে পারে।"

"না, না," মতিলাল মাথা নাড়লেন, "আমার ব্লাডপ্রেশার নেই। আর ঠিক সে-ভাবে হার্টের কোনো অসুখও নেই। যেটা ছিল তাকে লাংস-এর অসুখ বলা যায়। এখন সেটা তো নেই। বুঝতে পারি না অন্তত। এক-আধবার অ্যালার্জি-মতন হয়, নিশ্বাসের কষ্ট থাকে এক-আধ দিন। তারপর যেমন-কে তেমন।...যাক্‌গে, জুড়ন আর কী বলেছে?"

গোরা চট করে কিছু বলল না। ভেবেচিন্তে আমতা-আমতা করে বলল, "ও বলছিল, আপনি অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলেন, মানে মনে-মনে অদ্ভুত সব দৃশ্য দেখেন...।"

মতিলাল গোরার দিকে তাকিয়ে ছিলেন, কথা শুনছিলেন। গোরা চুপ করে যাবার পর কিছুক্ষণ কোনো কথা বললেন না উনি। তারপর বললেন, "হ্যাঁ, আমি দেখি। মানে দেখেছি। অদ্ভুত দৃশ্যই দেখেছি। কিন্তু তোমরা যা ভাবছ, মনে-মনে দেখছি—তা নয়, আমি চোখের সামনেই দেখেছি।"

"কী দেখেছেন?" অনিল জিজ্ঞেস করল।

"এখন বলব না। বললে তোমরা ভাববে আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। বিকেল হোক। হয়তো সেই পাগলামি এখনও রয়েছে। বিকেলে তোমাদের বলব। তোমরা বুঝতে পারবে, আমি কী দেখেছি।"

অনিলরা আর কিছু বলল না। বুঝতেই পারল, মতিকাকা এখন কিছু বলবেন না।

উঠে পড়ল দু'জনে।

বাগানে ঘোরাঘুরি করল সামান্য। এবার শীতে গোলাপের বাহার মাঝারি। হয়তো আরও সামান্য পরে বাগান ভরে উঠবে।

গোবিন্দ মালী কাছাকাছি নেই, থাকলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেত। জুড়নও বাড়িতে নেই। সে সাতসকালে কোথায় বেরিয়ে গিয়েছে সাইকেলে চেপে, ফিরতে বেলা হবে।

অনিলরা বাগানের পেছন দিক দিয়ে ঘুরে এসে অমরকে ধরল। অমর তার নার্সারি-ঘরে বসে চিঠিপত্র লিখছিল। ফুল বিক্রির হিসেব, টাকার তাগাদা। গোলাপচারার জন্যেও চিঠি আসে নানান জায়গা থেকে, তার জবাবও লিখতে হয় অমরকে।

অনিলরা বাইরেই বসল। বাইরে বেঞ্চি পাতা রয়েছে।

অমর বাইরে এল। বলল, "একটা বিড়ি খেয়ে নিই। তোমরা এসেছ শুনেছি।"

বিড়ি ধরিয়ে নিল অমর। "বাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

"হয়েছে। বাবু যেন কেমন বদলে গিয়েছে, অমরদা।"

"তাও তো প্রথম দিকে দেখোনি," অমর রোদে দাঁড়িয়ে হাই তুলে জড়তা ভাঙল। বলল, "প্রথম দু' দিন আমরা বড় ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম, বাবুকে এখানে রাখাই যাবে না। জুড়নকে আমিই কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম। এখানে আমরা কতটুকু কী করতে পারি, বলো। না ডাক্তার, না হাসপাতাল! ভগবানের দয়ায় বাবুর সেই অবস্থাটা কেটে গেল। পরশু থেকে ওঁকে খানিকটা ভাল দেখছি।"

অনিল বলল, "কী হয়েছিল, ঠিক করে বলো তো?"

"কী হয়েছিল, তা তো বলা মুশকিল! আমি কাছে ছিলাম না। বাবু বাগানে ছিলেন। গোবিন্দ মালা কাজ করছিল। বিকেল শেষ হয়ে আসছে তখন। মালীর বাগানের কাজও প্রায় শেষ। বাবু—ওই যে পশ্চিম দিকে—যেখানে একটা চৌবাচ্চার মতন করা আছে জল জমিয়ে রাখার জন্যে, দেখেছ তো?"

দেখেছে অনিলরা চৌবাচ্চা। বাগানে জল দেবার সুবিধের জন্যে এ-রকম চৌবাচ্চা গোটা-দুই আছে। কুয়োতলা থেকে টেনে এনে জল দেবার অসুবিধে বলেই, পুবে পশ্চিমে দুটো বড়-বড় চৌবাচ্চা আছে জল জমিয়ে রাখার জন্যে।

অমর বলল, "বাবু ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলেন। ওঁর হাতে একটা বড় কাঁচি ছিল। ডালপালা কাটার জন্যে। হঠাৎ নাকি বাবু ভীষণভাবে চেঁচিয়ে ওঠেন। গোবিন্দ খানিকটা তফাতে ছিল। বাবুর চিৎকার শুনে তাকিয়ে দেখে, বাবু টলছেন। সে ছুটে আসতে-আসতে বাবু বাগানের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে অজ্ঞান। ভাগ্যিস কাঁচিটা পড়ে গিয়েছিল হাত থেকে, নয়তো কী যে হত কে জানে!"

"কাকা মাটিতে পড়েই অজ্ঞান হয়ে যান?"

"হ্যাঁ। ওঁকে যখন বাড়ির মধ্যে নিয়ে শুইয়ে দেওয়া হল, তখন ওঁর সমস্ত শরীর কেমন বেঁকে যাচ্ছিল, গায়ের রঙ কালচে হয়ে গিয়েছে। চোখ বোজা, মুখের চেহারাই পালটে গিয়েছে।"

"মুখে গ্যাঁজলা উঠছিল? গোরা বলল।

"না। ঠোঁট, নাক এত নীল হয়ে গিয়েছে যে, মনে হচ্ছিল পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছে।"

"তারপর?"

"সারা রাত্তির বাবুর হুঁশ থাকল না। আমরা তাঁকে ঘিরে বসে থাকলাম। সকালের দিকে বাবুর হুঁশ এল। তবে তিনি বিকার বকতে লাগলেন।"

অনিল বলল, "বিকার? কেমন বিকার?"

অল্প চুপ করে থেকে অমর বলল, "যা বলছিলেন, তার কোনো মাথামুণ্ডু নেই। একবার বলছেন, গোলাপবাগানের মাথার ওপর আর-একটা গোলাপবাগানের; একবার বলছেন—সমস্ত গোলাপ-বাগান ধোঁয়ায়-কুয়াশায় ভরে গিয়েছে; আবার বলছেন—গোলাপ-গাছগুলো লম্বায় তালগাছের মতন হয়ে গিয়েছে। এই রকম কত কী যে বলে যাচ্ছিলেন তার ঠিক নেই।"

"শুধু বাগান নিয়েই বলছিলেন?" অনিল জিজ্ঞেস করল।

"তা বলা যায়। বাগান পুড়ে যাচ্ছে, মাটি গলে যাচ্ছে, ছারখার হয়ে গেল সব—এই রকম বলতে-বলতে ভয়ে চিৎকার করে উঠছিলেন।"

মতি কাকা মাটিতে পড়েই অজ্ঞান হয়ে যান।

গোরা অনিলকে বলল, "ব্যাপারটা বাগান নিয়েই মনে হচ্ছে!"

অনিল মাথা নাড়ল। "হ্যাঁ।...জুড়ন তোকে কী বলেছে?"

"বাগানের কথাই বলেছে। তবে জুড়ন বলছিল মতিকাকা নাকি মানুষজনও দেখেছেন।"

অমর বলল, "বলেছেন হয়তো, তবে সেটা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। জুড়ন আবার ভিতু গোছের। তার কথা, বাবুকে ভূতে ভর করেছে। ওর কথা বাদ দাও, ও খানিকটা রঙ চড়িয়ে বলেছে তোমাদের কাছে। আমি তোমাদের বলছি, বাবু প্রথম দু' দিন ভুলভাল বলেছেন, বিকার বকেছেন। তাঁর শরীর খুব খারাপ গিয়েছে। খাওয়া-দাওয়া করেননি, ঘুম ছিল না। বাবু একটা ভয় পেয়েছেন। কিসের ভয়, তা বাপু আমি জানি না। এই দু' দিন উনি অনেকটা ভাল আছেন। তবে বারবার বলছেন, এই বাগান আর রাখবেন না। নষ্ট করে দেবেন।"

অনিল আর গোরা চোখ চাওয়া চাওয়ি করল।

গোরা বলল, "এই বাগান নষ্ট করার কথা সেই ঘটনার পর মাথায় এল, না, আগেই এসেছে?"

"আগে? না, একবারও নয়। বরং বাবু মাঝে বলছিলেন, বাগান আরও খানিকটা বাড়াবেন। এবারে গোলাপ-চাষ এখনও পর্যন্ত ভাল হয়নি। পুজোর পর আট-দশ দিন হঠাৎ বৃষ্টি নামল জোরে, মাটি আরও ভিজে গেল, শুকোতে পেল না। বোধহয় গোলাপের ক্ষতিই হয়েছিল বৃষ্টিতে। তবে এখন রোদে মাটি টানছে। মাঘের দিকে ফুল ভাল হবে।"

অনিল বলল, "তোমরা বাগানের কোনো অদলবদল দেখেছ?"

"অদলবদল? না। যেমন বাগান তেমনই আছে।"

"ওই যে পুলিনবাবু, তোমাদের ডাক্তার, উনি কী বলেছেন?"

"ওঁর কথা বাদ দাও। একবার বলেন মৃগী, একবার বলেন পক্ষাঘাত, আবার বলেন মাথার গোলমাল।"

গোরা হাত তুলে প্রসঙ্গটা থামিয়ে দিল। অনিলকে বলল, "চল একবার বাগানে যাই।"

অনিল পা বাড়াল।

বাগানের দিকে যেতে-যেতে গোরা বলল, "ব্যাপারটা বাগান নিয়ে। তুই কী বুঝছিস?"

"কিছুই বুঝছি না ভাই। আমার তো মাথায় আসছে না—মতিকাকা কেমন করে দু' দুটো বাগান দেখছেন, তাও একটার মাথায় অন্যটা। দ্বিতীয় বাগানটা কি শূন্যে ঝুলছে? আর গোলাপগাছ বেড়ে তালগাছের মতন লম্বা হয়ে গেছে—এটাই বা উনি কেমন করে দেখেন! চোখের দোষ, মানে চোখের কোনো ব্যাধি হল, না মাথার, কে জানে!"

গোরা বলল, "বাগানের ওপর হঠাৎ এত রাগই বা কেন হল কাকার যে, বাগান পুড়িয়ে নষ্ট করে দেবেন বলছেন?"

"আমার মাথায় ঢুকছে না।"

"দেখি, কাকা কী বলেন। তাঁর মুখ থেকে ব্যাপারটা শুনি। যদি কিছু বুঝতে পারি।"

অনিল কোনো কথা বলল না।

বিকেলের দিকে মতিলাল নিজেই ডাকলেন গোরাদের। তখনও আলো মরে যায়নি, ফিকে ও নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

অনিলরা স্নান-খাওয়া সেরে সেই যে গায়ে কম্বল চাপিয়ে ঘুম দিয়েছিল, উঠল বিকেল পড়ার মুখে। গা জুড়ে আলস্য, হাই উঠছিল। শীতের দিন বেলা পড়ে যাবার পর যেন ঠাণ্ডা আরও জড়িয়ে ধরে। চোখ-মুখ ধুয়ে দু' জনেই মতিলালের ঘরে হাজির হল।

মতিলাল বললেন, "চা খেয়েছ?"

মাথা নাড়ল গোরা।

"চা আনছে।...বোসো।"

বসল দু'জনে। মতিলালের ঘরটি বড়। শোওয়া-বসার ব্যবস্থা

ছাড়াও নানান ছোটখাটো আসবাসে ঘরটি ঠাসা। জিনিসপত্র রয়েছে বিভিন্ন ধরনের। বইয়ের একটা আলমারিও একপাশে। আলমারির ভেতরে, মাথায় গুচ্ছের বই এলোমেলো হয়ে পড়ে আছে।

মতিলাল বললেন, "তোমরা চা খেয়ে নাও, তোমাদের নিয়ে বাগানে যাব।" বলে একটু থেমে আবার বললেন, "আমি যা দেখেছি, তোমরা যে আজ সেই দৃশ্য আবার দেখবে, আমার মনে হয় না। আমি গতকালও একবার গিয়েছিলাম, দেখতে পাইনি। তার মানে কিন্তু এই নয় যে, আবার একদিন ওই দৃশ্য দেখব না; কিংবা অমন অদ্ভুত কাণ্ড ঘটবে না।"

অনিলরা কথা বলল না। মতিকাকার মুখ থেকেই সব শোনা ভাল। যতক্ষণ না শোনো যায়, ততক্ষণ চুপ করে থাকাই ভাল।

চা নিয়ে এল ঠাকুর।

মতিলাল তাগাদা দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও। বিকেল ফুরিয়ে গেলে চলবে না। যে-সময় ঘটনাটা আমি ঘটতে দেখেছি, সেই সময়ে তোমাদের ওখানে নিয়ে যেতে চাই। আমি কিন্তু তোমাদের সাবাধান করে দিচ্ছি, আমার গোলাপবাগান এখন বিপদের ব্যাপার হয়ে রয়েছে। তোমরা যদি না-চাও, যেও না।"

অনিল বলল, "আমরা যাব। বিপদ আমাদের গিলে ফেলবে না। আপনারা সবাই রয়েছেন এখানে। বিপদ তো আপনাদেরও :

"বেশ। তা হলে তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নাও।"

অনিলরা যত তাড়াতাড়ি পারে চা শেষ করল। প্যাণ্ট শার্ট পুলওভার তারা আগেই পরে নিয়েছে, যা শীত।

অনিল আর গোরাকে নিয়ে মতিলাল বাগানে চললেন।

তখন আর বাগানে রোদ বলে কিছু নেই। খুব পাতলা এক আলোর রেশ আকাশের তলায় ছড়িয়ে রয়েছে। গোধূলিবেলার মতন লাগছিল। কনকনে বাতাস দিচ্ছে উত্তর থেকে।

মতিলাল বাগানের পশ্চিম দিকে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর পাশেই এক জলের চৌবাচ্চা। সামনে গোলাপঝাড়।

মতিলাল একবার চারদিকে তাকিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, "সেদিন মোটামুটি এইরকম সময় আমি এখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম। আমি···ওই যে গোলাপগাছটা দেখছ···ওই যে লাল গোলাপগাছটা···ওই গাছের কয়েকটা ডাল ছেঁটে দেবার জন্যে কাঁচি হাতে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম, ডালগুলো আজই ছাঁটব, না আরও একটু বাড়লে ছাঁটব। এমন সময় আমার মনে হল, হাওয়ার ঝাপটায় যেন গা কেমন দুলে উঠল। বুঝতেই পারছ, এখন শীতের বাতাস কনকন করে ছোটে। যেমন আজ ছুটছে। কিন্তু এই হাওয়া তো ঝড় নয় যে, আমায় ঠেলে ফেলে দেবে!···আমি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে আবার যখন গোলাপগাছটার দিকে তাকিয়েছি···দেখি ওই গাছের মাথার ওপর কেমন এক ফিকে নীলচে আভা। আমি যদিও বলছি ফিকে নীলচে আভা, তবু রঙটা যে ঠিক কেমন তা বোঝাতে পারব না। উনুনের আঁচ ওঠার পর যেমন আগুনের একটা গনগনে ভাব উনুনের ওপর দেখা যায় প্রায় ওই ধরনের খুব ফিকে এক আভা গোলাপগাছের মাথায়। তারপর দেখি, সেই আভার ওপর একটা গাছ ধীরে-ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। অবিকল ওই গোলাপগাছটার মতন। চোখের ভুল ভেবে আমি এপাশ-ওপাশ তাকালাম। তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। এপাশ-ওপাশের গাছগুলোর মাথার ওপরেও অবিকল সেই একই রকম দৃশ্য। দেখতে-দেখতে এই বাগানের মাথার ওপর আর-একটা বাগান — ঠিক এইরকম, অবিকল এই রকম বাগান ভাসতে থাকল। গোটা বাগান কি না, তা আমি বলতে পারব না, কেননা তখন আমার এমন অবস্থা যে, চারদিকে তাকিয়ে কী দেখেছি, তা আমার খেয়াল নেই। তবে এটকু বলতে পারি, বাগানের অনেকটাই অংশ শূন্যে ভাসছিল।"

গোরা আর অনিল মতিকাকার কথা শুনছিল অবাক হয়ে। তাদের চোখের পলক পড়ছিল না।

মতিলাল যেন দম নিলেন সামান্য। তারপর বললেন, "চোখের

ভুল ভেবে আমি প্রথমটায় ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু তার পরেই দেখি, গোলাপগাছগুলো মাথার দিকে বেড়ে যাচ্ছে লম্বা হয়ে যাচ্ছে। এত তাড়াতাড়ি এমন অদ্ভুদভাবে সেগুলো লম্বা হতে লাগল যে, মনে হল এগুলো আকাশের দিকে উঠে যাবে। আমি ভীষণ ভয় পেয়ে গেলাম। আমার শরীরের মধ্যেও কেমন কেমন করতে লাগল। একরাশ কুয়াশা যেন ভেসে আসতে লাগল চারদিক থেকে। আমি ভয়ে চিৎকার করেছিলাম কিনা মনে নেই। তখনই হয়তো অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যাই।"

মতিলাল থেমে গেলেন।

অনিলরা কিছুক্ষণ মতিলালের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বাগানের দিকে তাকাল। মতিকাকা যা বললেন, তা বিশ্বাস করা যায় না, তারা কোনো হেরফের দেখছে না বাগানের।

অনিল বলল, "আপনি এ রকম ঘটনা আর ঘটতে দেখেছেন? মানে এই বাগানে আর ঘটেছে?"

মাথা নাড়লেন মতিলাল। "না। আগে এমন দৃশ্য আমি দেখিনি। শরীরটা সামলে নিয়ে আমি গতকালও একবার এই সময় এখানে এসে দাঁড়িয়েছিলাম। কিছুই চোখে পড়েনি। যা দেখেছি, ওই একদিনই।"

গোরা বলল, "আপনি সেদিন অসুস্থ ছিলেন না তো?

"না। একেবারেই নয়। পুরোপুরি স্বাভাবিক ছিলাম। বরং তোমাদের বলি, ওই দৃশ্য যখন দেখছিলাম, তখন আমার শরীরের মধ্যে ভীষণ এক কষ্ট হচ্ছিল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল, শরীরের মধ্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে যাবার মতন লাগছিল; মাথা ভার, অবশ হয়ে আসছিল। সোজা কথায় আমার শরীরের মধ্যে একটা অদ্ভুত কিছু ঘটে যাচ্ছিল।"

বিকেলের আলো পালিয়ে গেল। ছায়ামেশানো অন্ধকার নামছে। অনিল একবার আকাশের দিকে তাকাল। চোখ নামিয়ে বলল, "আপনার শরীর এখন ভাল?"

"কাল থেকে অনেকেই ভাল। তার আগের দু' দিন আমি আমাতে ছিলাম না।"

গোরা বলল, "এখন কি আপনি পুরোপুরি সুস্থ ?

"না। ভেতরে দুর্বলতা রয়েছে। মাঝে-মাঝে হাত পা কেঁপে যাচ্ছে। চোখের দৃষ্টিটাও থেকে-থেকে ঝাপসা হয়ে আসছে।"

মতিলাল আর বাগানে দাঁড়াতে চাইলেন না, বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগলেন। গোরারাও ওঁর পেছন পেছন চলল।

"এ-রকম কেন হল, আপনি কিছু বুঝতে পারছেন ?" অমিল জিজ্ঞেস করল।

মতিলাল মাথা নাড়লেন। "না। বুঝতে পারলে তো স্বস্তি পেতাম। আমি কোনো কারণ খুঁজে পাইনি। তবে চেষ্টা করছি।

"চোখের ভুল বা শরীর হঠাৎ খারাপ হয়ে যাবার জন্যে নয় ?"

"না না, একেবারেই তা নয়। নিতান্ত চোখের ভুল অতক্ষণ থাকতে পারে না। নিমেষের জন্যে চোখের ভুল হয়। আমি যা দেখেছি তা দু' এক পলকের ব্যাপার নয়।"

"কতক্ষণ দেখেছেন ?"

"বলতে পারব না। সময়ের হিসেব থাকে না তখন। তবে পাঁচ-সাত মিনিট নিশ্চয়।"

"আর কেউ দেখেনি ? গোবিন্দমালী তো কাছেই ছিল।"

"গোবিন্দ একেবারে কাছে ছিল না। সে খানিকটা তফাতেই ছিল। মাটিতে বসে সার মেশাচ্ছিল। তার নজর ছিল না।"

"গোবিন্দরও কি শরীর খারাপ হয়েছিল "

"খানিকটা হয়েছিল। কম। তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল। বমিও করেছে। পরে সামলে নিয়েছে।"

অনিলরা আর কিছু বলল না।

* * *

মতিকাকার কাছে দুটো দিন কাটল অনিলদের। এই দু'দিনে

নতুন কিছু ঘটেনি। একটা জিনিস তারা লক্ষ করছিল। প্রথম এসে মতিকাকাকে যত বিচলিত দেখেছিল, বা তাঁর শরীর যতটা খারাপ দেখেছিল, এখন যেন তার চেয়ে কম দেখাচ্ছে। বোধহয়, নিজেকে সামলে নিয়েছেন অনেকটা। এমনও হতে পারে অনিলরা কাছে থাকায় তিনি সাহসও পাচ্ছেন কিছুটা। রোজই বাগান নিয়ে কথা বলেন, আলোচনা করেন, কেন অমন অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল—তা নিয়ে মাথা ঘামান। তবে একটা বিষয় মতিকাকা প্রায় মনঃস্থির করে ফেলেছেন। এই বাগান আর তিনি রাখবেন না। নষ্ট করে ফেলবেন।

মতিকাকার বাগানের লোকরা বেশ মনমরা হয়ে পড়েছে। বাগান যদি নষ্ট করে ফেলা হয়, তাদের কী গতি হবে! তাদের ধারণা, বাবু যা দেখেছেন, ভুল দেখেছেন। একবার ভুল করে কী দেখেছেন, তার জন্যে এমন বাগান কেউ নষ্ট করে! কত পরিশ্রম করে তৈরি করা হয়েছে এই গোলাপবাগান। অমর বলছিল, "তোমরা বাবুকে বুঝিয়ে বলো, এ একেবারে নিজের পারে কুড়ুল মারা হচ্ছে। আমরা এতগুলো লোক বহাল তবিয়তে আছি, বাবুই শুধু ভয় পাচ্ছেন।"

সেদিন সন্ধেবেলায় মতিকাকার ঘরে বসে গোরারা কথা বলছিল। কথায়-কথায় অনিল বলল, "আপনি এত তাড়াতাড়ি বাগান নষ্ট করবেন না, কাকাবাবু।"

মতিলাল তাকালেন, কথা বললেন না।

অনিল বলল, "যা ঘটেছে, একবারই ঘটেছে। আবার যদি ঘটে তখন না হয়..."

"আবার ঘটবে এমন কথা নেই," মতিলাল বললেন, "ঘটবে কি না-ঘটবে তা নিয়েও আমি ভাবছি না, আমি ভাবছি—পরিণাম।"

গোরা আর অনিল মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল।

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মতিলাল বললেন, "আজ

ক'দিন আমি অনবরত ভাবছি। ভাবছি আর ভাবছি।" বলে তিনি আঙুল দিয়ে কয়েকটা বইপত্র দেখালেন। বললেন, "তোমরা জানো, আমার নানা ধরনের বই পড়ার অভ্যেস আছে। পেশায় আমি কেমিস্ট ছিলাম। সে পেশা ছেড়েছি অনেক কাল আগে। তবে বইপত্র ঘাঁটি নানা জাতের। আমি যা দেখেখি, তার একটা মাত্র যুক্তি আমি খাড়া করতে পেরেছি। সে-যুক্তি নড়বড়ে, ধোপে টিকবে কিনা জানি না।"

অনিলরা কৌতূহল অনুভব করল। কাকা যে কোনো যুক্তি খাড়া করতে পেরেছেন, তারা জানত না। উনি কিছু বলেননি।

গোরা বলল, "কী যুক্তি?"

মতিলাল বললেন, "কতকগুলো জিনিস আছে, আদি জিনিস, যার ভালমতন জবাব আজও দেওয়া মুশকিল। ওপর-ওপর তার জবাব আছে, খুঁটিয়ে দেখলে রহস্যময় মনে হয়। যেমন মাধ্যাকর্ষণ বা মাধ্যাকর্ষণের মূল রহস্যটাই আমরা এখনও জানতে পারিনি। এই রকম আর এক রহস্য হল—ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এর সম্পর্কে প্রত্যেকটি প্রশ্নের খুঁটিনটি জবাব হয় বলে অনেকেই মানেন না।"

অনিল বলল, "এই বাগানের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী?"

বোধহয় আছে। আমার যা মনে হয়েছে, বলছি। আমি কখনও বলব না, আমি যা বলছি তা সত্যি। আমি আমার অনুমানের কথা বলছি।

গোরা মাথা হেলাল, "বলুন।"

"এই বাগানটার কথা এবং যে-সময়ে আমি ওই অদ্ভুত দৃশ্য দেখেছি তার কথা এবার ভাবো। তখন পড়ন্ত বিকেল, মানে বিকেল শেষ হয়েছে প্রায়, আকাশে ফিকে আলো রয়েছে শীতের আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম একটা জলভরা বড় চৌবাচ্চারা কাছে। আমার সামনে গোলাপগাছের ঝাড়। বুঝতে পারছ?"

"পারছি।"

"ধরো, যদি এমন হয়···আমি যখন গোলাপগাছগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, ঠিক তখন ওখানে আচমকা একটা ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছিল। তোমরা কি জানো, ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইনটেনসিফায়েড হলে অনেক কিছু হতে পারে।"

"না," অনিল মাথা নাড়ল। "ম্যাগনেটিক ফিল্ড জানি। ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ড জানি না।"

"ব্যাপারটা তো তোমাদের বোঝানো যাবে না। তবু বলি, ম্যাগনেটিক ফিল্ড, বা চৌম্বকক্ষেত্র—যদি সাধারণ বা স্বাভাবিকের বেশি হয়ে ওঠে তাকে ইন্‌টেন্‌স বলতে পারো। অবশ্য এই ইন্‌টেনসেরও মাত্রা আছে। যেমন গরমের থাকে. উনুনের তাত আর চুল্লির তাত ভেবে নাও।"

"এটা কেমন করে হয় ? মানে ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ড ?"

জানি না। আমি জানি না। বিজ্ঞানীরা কলাকৌশল করে করতে পারেন পড়েছি। আবার প্রকৃতির খেয়ালেও হয়। ম্যাগনেট্ কথাটা শুনতে সহজ, কিন্তু এই প্রাকৃতিক শক্তিটির অনেক বিষয় আমরা আজও জানি না। এটি একটি রহস্যময় শক্তি।"

অনিল বলল, "আপনি যা চোখে দেখেছেন, তার সঙ্গে ওই ফিল্ডের সম্পর্ক কী ?"

"বলছি। তার আগে বলি, তোমরা মরীচিকা বা মিরাজ কেন হয় জানো ?"

"মরুভূমিতে হয়।"

"শুধু মরুভূমিতে নয়, পাহাড়ের মাথা থেকে নীচে তাকালেও দেখা যায় ; সমুদ্রেও হয়। কেন হয় ?"

"মরুভূমিতে হয় তেতে ওঠা বালির জন্যে।"

"হ্যাঁ—তবে সবটা বললে না। মিরাজ বা মরীচিকা হল প্রকৃতির একটা ট্রিক বা চালাকি। আবহাওয়ার মধ্যে কতকগুলো ব্যাপার থাকা দরকার ; না থাকলে মিরাজ হয় না। প্রথমেই ধরো, আমরা যা দেখি, যে-কোনো জিনিস, তা দেখা সম্ভব হত না,

যদি না সেই জিনিস থেকে আলোর রশ্মি প্রতিফলিত হত, হয়ে আমাদের চোখে এসে পৌঁছত। এখন এই আলোর রশ্মি আমাদের চোখে কেমন করে আসে। সাধারণত স্ট্রেট লাইনে।"

অনিল ঘাড় নাড়ল। "মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায়—দিনের বেলার উত্তপ্ত বালির জন্যে।"

"হ্যাঁ, বালি অসম্ভব গরম হয়ে ওঠার জন্যে নীচের দিকে···মানে মাটিই বলো এখানে··বাতাস তপ্ত হয়ে থাকে। এই গরম বাতাসের স্তর একরকম আয়নার মতন কাজ করে। এখন কী হয় জানো ? অনেক দূরের···দিগন্তের কোনো অবজেক্টের আলো এসে এই 'আয়নার' ওপরে পড়ে···সেই জিনিসটার ছবি প্রতিফলিত হয়ে আমাদের চোখে ধরা দেয়। আসলে বলতে পারো, গরম বাতাস আয়নার মতন কাজ করছে বলেই এই মিরাজ। আলোর রেখাও কিন্তু গরম বাতাসে বেঁকে যায়।"

গোরা কেমন অবাক হয়ে মতিকাকাকে দেখছিল। তার মাথায় ঢুকছিল না—কাকা মিরাজের কথা কেন তুলেছেন।

মতিলাল বললেন, "মরুভূমির কথা থাক। এবার সমুদ্রের কথা বলি। সমুদ্রেও মরীচিকা দেখা যায়; মিরাজ। সমুদ্রের বেলায় অবস্থা পালটে যায়। জলের ওপরকার বাতাস ঠাণ্ডা, যত ওপরে ওঠা যাবে—বাতাস তত গরম। দূরের কোনো জাহাজের গা থেকে আলোর ঢেউ এসে সেই গরম বাতাসে লাগলে তার যে প্রতিফলিত ছবি আমরা চোখে দেখব, তা কিন্তু জলে দেখব না, দেখব শূন্যে।"

অনিল বলল, "আপনি কি তাই দেখেছিলেন ?"

মতিলাল যেন হাসবার চেষ্টা করলেন। বললেন, "একটা অদ্ভুদ কথা বলি তোমাদের। সিসিলির নাম শুনেছ নিশ্চয়, ইটালি··· সিসিলি। সেই সিসিলিতে ষ্ট্রেট অব মেসিনাতে এইরকম এক জগৎ-বিখ্যাত মিরাজ দেখা যায়। পুরো মেসিনা শহরটাকে আকাশে ঝুলছে দেখা যায়। ইটালিয়ানরা একে বলে Fata Morgana। আগেকার লোকরা ভাবত, মরগান লে ফে বলে

একজন অপদেবতা এই কাণ্ডটি করেছিল। অবশ্য আজ সবাই জানে, ওটা অপদেবতার কাজ নয়, প্রকৃতির চালাকি।"

গোরা বলল, "আপনার বেলাতে একই কাণ্ড ঘটেছে?"

মতিলাল মাথা দোলালেন। "আমার তাই অনুমান। যুক্তি হিসেবে আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।"

"আপনি যে ম্যাগনেটিক ফিল্ডের কথা বলছিলেন?"

"হ্যাঁ। ঘটনাটা এইভাবে ঘটেছে বলে আমার ধারণা," মতিলাল বললেন, "সেদিন, যে-কোনো কারণেই হোক, ওই জায়গায়···আমি যেখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম তার আশেপাশে একটা ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ড তৈরি হয়েছিল। আর ওই একমাত্র কারণে বাতাস অস্বাভাবিক গরম হয়ে উঠেছিল। বাগানের মাটির দিকটা ছিল অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা, ওপরের দিকে যত স্তর ছিল—বায়ুস্তর—সেগুলো ভীষণ গরম হয়ে উঠেছিল। তপ্ত সেই বায়ুস্তর আয়নার মতন কাজ করছিল। যার ফলে আমি একটা মিরাজ দেখেছি। আর বাগানের ছবিটা যে আসল বাগানের মাথার ওপর দেখেছি, তার কারণও ওই, ওপরের দিকেই মিরাজ হয়েছে। অবশ্য যে-মিরাজ আমি দেখেছি, সেটা সোজা ছিল। এ-ক্ষেত্রে হওয়া উচিত ছিল উলটো। সোজা কেন হল, তার জবাব আমার জানা নেই। বোধহয় ইন্‌টেন্‌স ম্যাগনেটিক ফিল্ডের জন্যে।"

"আপনার শরীর অসুস্থ হল কেন?"

"আমি সেই ইনটেন্‌স্ ম্যাগনেটিক ফিল্ডের মধ্যে ছিলাম। আরও বেশি খারাপ হতে পারত। হয়নি, এ আমার সৌভাগ্য।"

"গোবিন্দ মালীর বেলায় কিছু হল না কেন?"

"গোবিন্দ আমার গায়ের কাছে ছিল না। সে খানিকটা তফাতে ছিল। ধরো চল্লিশ-পঞ্চাশ গজ। মাটিতে বসে-বসে সার মিশিয়ে তৈরি করে রাখছিল। সে মুখ তুলে তখন তাকায়নি। সে ঠাণ্ডার মধ্যে ছিল। পরে যখন সে উঠে আমার কাছে আসে,

তখন বোধহয় ম্যাগনেটিক ফিল্ড হালকা হয়ে যাচ্ছিল। তবু তার শরীর খারাপ হয়েছে।"

গোরা আর অনিল চুপ করে থাকল। তারা বোধহয় তখনও বুঝতে পারেনি ভাল করে।

অনিল বলল, "আপনি যা বলছেন; এটাই একমাত্র যুক্তি?"

"না, না। আমি বারবার বলেছি, আমার বুদ্ধিমতে যতটা পেরেছি, একটা কারণ বার করার চেষ্টা করেছি। আমার যুক্তি ভুল হতে পারে।

"তা যদি হয়, মরীচিকাই হয়, আপনি এই বাগান নষ্ট করতে চাইছেন কেন।

"চাইছি একটা মাত্র কারণে।...যে যাই বলুক, এই বাগানের কোথায় কী ঘটে গিয়েছে আমরা জানি না। যদি কোনো ক্ষতি হয় ভবিষ্যতে, আমি তো কিছু করতে পারব না।

"তেমন ক্ষতি হতে পারে?"

"পারে, নাও পারে। কেমন করে বলব?"

"এরা যে বাগান নষ্ট করতে দিতে চাইছে না?"

"আমিও কি চাই চাই। আমার নিজের হাতে গড়া গোলাপ-বাগান। কিন্তু কী করব, বাবা!...দেখি, আরও ক'দিন ভেবে দেখি।"

[]

☐ কেঁচো খুঁড়তে সাপ ☐

আমার নাম জীবনলাল ; জীবনলাল দত্তগুপ্ত। ওটা আমার আসল নাম। একটা নকল নামও রয়েছে। লালা দত্ত। আমার আসল নাম যত লোক জানে, নকল নামটা তার চেয়েও বোধ হয় বেশি লোক জানে। হয়তো আপনিও জানেন, বা শুনেছেন। না শুনলেও ক্ষতি নেই। আমি মোটেই কেষ্টবিষ্টু গোছের লোক নই। একেবারে সাধারণ, সাধারণ, চুনোপুটি। তবু যে বলছি, শুনলেও শুনে থাকতে পারেন নামটা, তার কারণ আমি একজন গোয়েন্দা-গল্পের লেখক। লালা দত্ত এই নামে শিহরণ' সিরিজের গোয়েন্দাবই লিখি। না না করেও আমার বইয়ের সংখ্যা প্রায় কুড়ি।

নিজের কথা এখানে সামান্য বলে নেওয়া দরকার। গোয়েন্দা-গল্প লেখাটা আমার পেশা নয়, শখ। আমার পেশা কেরানিগিরি। ট্রাম কম্পানিতে চাকরি করি। আমাদের মেসবাড়িকে কোলে বাজারের সঙ্গে তুলনা করা যায়। হট্টখানা। ওরই মধ্যে কোনো রকমে থাকা খাওয়া—এই আর কি !

আমার বাবা নেই। মা থাকেন দেশের বাড়িতে। ছোট ভাই—সেও দেশের বাড়িতে থাকে, প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার। নিজের ঘরবাড়ির কথা বেশি বলে লাভ নেই। একসময় একরকম ভালই কেটে যাচ্ছিল, বাবা মারা যাবার পর বড় কষ্টে পড়েছিলাম। তখন আমি কলেজে পড়তাম। আট-দশ বছর লড়ালড়ি করে এখন খানিকটা থিতু হয়েছি। আমার বয়েস হয়েছে তিরিশ।

গোয়েন্দাগল্প লেখার শখ আমার আগে ছিল না। তবে হ্যাঁ— দেদার গোয়েন্দাগল্প পড়তাম। আমার বন্ধু পশুপতি আমার চেয়েও গোয়েন্দাগল্পের পোকা ছিল। একবার সে একটা গল্প লিখতে শুরু করে আর শেষ করতে পারল না। আমাকে দিয়ে শেষ করাল লেখাটা। সেই লেখাটা 'কালসর্প' নামে ছাপা হল পানুবাবুর প্রেস থেকে। কিছু বিক্রিও হল।

তখন থেকেই আমার শখ চাপল গোয়েন্দগল্প লেখার। পশুপতি আমায়, যাকে বলে মদত, তাই দিতে লাগল। আমি ধীরে ধীরে গোয়েন্দাগল্পের লেখক হয়ে উঠলাম।

পশুপতি কথা এখানে একটু বলতে হয়। পশুপতি আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আমরা বর্ধমানের লোক। কাছাকাছি গ্রামের ছেলে। আমরা দু'জনে একসঙ্গে কলেজেও পড়েছি। পশুপতির বরাবর সাধ ছিল সে উকিল হবে। গ্রহের ফেরে তার উকিল হওয়া হল না। তার মামা, আমরা যাঁকে বলি সদানন্দমামা, পশুপতিকে হোটেলের ব্যবসায় ঢুকিয়ে নিজে চলে গেলেন মনসা-গ্রামে আশ্রম খুলতে। মামার নিজের বলতে এক পশুপতিই ছিল। আমার তো মনে হয়, এতে শাপে বর হয়েছে। পশুপতির যে-ধরনের মাথাগরম ধাত, তাতে তার উকিল হওয়া চলত না।

শিয়ালদা হ্যারিসন রোডের কাছাকাছি যত হোটেল আছে তত হোটেল আর কোথায় আছে আমি জানি না। পশুপতি হল দয়াময়ী হোটেলের ম্যানেজার। মালিকও বলা যায়। খাতাপত্রে মামা এখনও মালিক, কিন্তু মামার অবর্তমানে পশুপতিই মালিক হবে।

আগেই বলেছি, আমি যে মেসে থাকি সেটা একটা জঘন্য জায়গা। হইচই, গলাবাজি, লাঠালাঠি লেগেই থাকে। একটু নিশ্চিন্তে শোওয়া-বসার উপায় নেই। দু' দণ্ড আপনমনে থাকব— তার জো নেই।

এইসব কারণে আমি একটা অভ্যেস করে নিয়েছিলাম। যখন কোনো লেখা শুরু করতাম, তখন আর মেসে থাকতাম না, পশুপতির হোটেলে এসে ডেরা বাঁধতাম। সাত দিন আট দিন, এমন কী দিন দশেকও একটানা হোটেলে থেকে লেখা শেষ করে. বেশির ভাগ প্রুফটা দেখে দিয়ে তবে হোটেল ছাড়তাম এ-ব্যাপারে পশুপতির ঢালাও হুকুম ছিল, আমি যখনই আসব পুব দিকের ছোট ঘরটা পাব হোটেলের, দোতলার ঘর। আমার খাওয়া-দাওয়া,

ফাইফরমাস খাটা, চা পান সিগারেটের ব্যবস্থা করে দেবার যেন কোনো ত্রুটি না হয়।

পশুপতি এই রকমই। আমায় যতটা ভালবাসে ততটাই তার দাপট দেখানোর পাত্র করে তুলেছে। ওর কথা না মেনে আমার উপায় নেই। আমার কাছে টাকাপয়সা নেবে না। এ নিয়ে আমার সঙ্গে ঝগড়াও হয়েছে খুব। আমি ওর সঙ্গে ঝগড়ায় হেরে গিয়েছি। তবে হ্যাঁ, আমি এক জায়গায় জিতেছি। ও আমাকে মেস ছাড়িয়ে তার হোটেলে এনে রাখতে পারেনি।

ব্যাপারটা এখন এই রকম দাঁড়িয়েছিল; আমি দু-তিন মাস অন্তর একবার করে পশুপতির হোটেলে এসে উঠতাম। আট দশ দিন থাকতাম একটানা। একটা বই লিখে, তার প্রুফ দেখে আবার ফিরে যেতাম আমার মেসে। তার মানে এই নয় যে, পশুপতির কাছে আমি অন্য সময়ে আসতাম না। তা আসতাম। হপ্তায় বার দুই এসে তার খোঁজখবর করে যেতাম। পশুপতিই আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু—তার কাছে না এসে থাকব কেমন করে?

আর মাত্র দুটো কথা বলে আমার গল্প শুরু করব।

আমি সাত-আট দিনে একটা বই লিখতে পারি ভেবে আপনার হয়তো অবাক হচ্ছেন। এতে অবাক হবার বেশি কিছু নেই। প্রথমত, আমি যা লিখব, মানে গল্পটা, মনে মনে আগেই সাজিয়ে নিতাম। দু' তিন মাস ধরে এটা চলত। তারপর ঝপ করে একদিন কাগজ কলম নিয়ে বসতাম। চলে আসতাম পশুপতির হোটেলে। আমি তাড়াতাড়ি লিখতে পারি। তা ছাড়া, বসতাম যখন ঘাড় গুঁজে টানা লিখে যেতাম সকাল দুপুর। আমি শখের গোয়েন্দাগল্পের লেখক—আমার হুড় হুড় করে লিখতে আটকাবে কেন! আর লেখা তো বড়জোর সোয়া শ' পাতা। ছাপা হলে দাঁড়াবে নব্বই ছিয়ানব্বই। পানুবাবু তাকে শ'খানেক পাতায় দাঁড় করাতেন। পানুবাবু আমাদের পুরনো চেনাজানা লোক। তাঁর

প্রেসেই আমার বইয়ের কাজ হত বরাবর। তিনি অন্য কাজ সরিয়ে আমার কাজটা করে দিতেন। কখনও অন্যথা করেননি।

গত চার-পাঁচ বছর এইভাবেই আমার বই লেখা চলছিল। লালা দত্ত এই নামে 'শিহরন' সিরিজের পনেরো-কুড়িটা বইও লিখলাম। প্রতি বই পিছু সাতশো টাকা পাই এখন। আগে পাঁচশো পেতাম। আমার এতে দুঃখ ছিল না। তো পাই। 'তারিণী লাইব্রেরি'র মহিবাবুর যতই বদনাম থাক, আমার সঙ্গে কোনো গোলমাল করেননি। উনিই 'শিহরন সিরিজ'-এর প্রকাশক।

শেষ পর্যন্ত কিন্তু একটা অঘটন ঘটল। সেটাই বলি।

* * *

দিনটা ছিল শনিবার।

সেই সকাল আটটায় কলম নিয়ে বসেছিলাম। উঠলাম যখন তখন দুপুর দেড়টা। লেখা শেষ। নিশ্চিন্ত।

স্নান খাওয়া শেষ করে যখন পান মুখে বিছানায় শুতে এলাম, তখন আড়াইটে বেজে গিয়েছে।

সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে লেখার শেষটা মনে মনে ভাবছিলাম। মনে হল, মন্দ হয়নি। গত রবিবার লেখা শুরু করেছিলাম। ঠিক সাত দিনে শেষ হল। অবশ্য এই লেখাটা একটু ছোট। আশি পঁচাশি পাতা হতে পারে। গত সোমবার থেকেই আমি পানুবাবুকে কপি দিচ্ছি। মঙ্গলবার থেকেই প্রুফ পাচ্ছি। মঙ্গলবারে পেয়েছি সামান্য। বুধবারে খানিকটা। শেষ বারো-চোদ্দ পাতা বাকি ছিল লেখার। আজ থেকে আমি কোনো প্রুফ পাইনি। গতকাল হোটেলের বলাইকে দিয়ে পানুবাবুর প্রেসে কপি পাঠিয়েছি। পানুবাবুর প্রেস থেকে নিধু বলে এক ছোকরা সন্ধের মুখে কালিঝুলি মাখা, ভিজে স্যাঁতসেঁতে এক বাণ্ডিল প্রুফ আমায় দিয়ে যায়। সে বৃহস্পতিবার আসেনি, গতকালও নয়। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। পানুবাবুর প্রেসে কি কম্পোজ হচ্ছে না? নাকি

নিধুর অসুখবিসুখ হল? বলাইকে বলেছিলাম খোঁজ আনতে! সে হোটেলে কাজ করে প্রেসের ব্যাপার বোঝে না। ফিরে এসে কিছুই বলতে পারল না।

ভাবলাম, আজ সন্ধেবেলায় নিধু আসবে। প্রুফ আনবে। তার হাতেই শেষ কপিটা দিয়ে দেব। কাল অবশ্য রবিবার। প্রেস বন্ধ। দেখা যাক নিধু কী বলে!

সন্ধেবেলায় পশুপতির সঙ্গে আড্ডা মারতে মারতে মারতে আটটা বেজে গেল। নিধু এল না।

পশুপতি বলল, "পুজোর পর তো! পানুবাবুর হাতে স্কুলের বইয়ের কাজ। বোধ হয় আটকে গেছেন। সোমবার নিশ্চয় পাঠাবেন।"

"সোমবার আমি থাকব না। কাল বিকেলেই মেসে ফিরে যাব।"

"সোমবার সন্ধেবেলাস এসে খোঁজ করে যাস।"

এ-রকম হামেশাই হয়। আমি মেসে ফিরে যাবার পর পশু-পতির কাছে পানুবাবু প্রুফ পাঠিয়ে দেন। আমি পশুপতির হোটেলে এসে প্রুফদা দেখে দিয়ে যাই। মেসে বসে এ-সব কাজ করি না আমি। মেসের দু' একজন ছাড়া কেউ জানেই না আমি শখের লেখক।

পশুপতির অফিসঘরে বসেই গল্পগুজব হচ্ছিল। পানুবাবুর কথা তুলে রেখে আমরা অন্য কথাবার্তা বলতে লাগলাম। পশুপতি তেতলায় একটা ঘর বাড়াবার কথা ভাবছে। তার হোটেলটা দোতলা। নীচে রান্নাবান্না, ঠাকুর-চাকর, খাবার ঘর—এই সব। দোতলায় ছোট আর মাঝারি মিলিয়ে গোটা বারো ঘর। হোটেলের ঘর বলতে যা বোঝায়। তেতলায় একটা মাত্র ঘর। সেই ঘরে পশুপতি নিজে থাকে। আর একটা ঘর। না বাড়ালে চলছে না। হোটেলের স্টোর রুমটা সে তেতলায় করবে।

ন'টা বেজে গেল।

পশুপতি বলল, "চল, ওপারে যাই। পঙ্কজের একটা নতুন রেকর্ড কিনেছি—তোকে শোনাব।"

পশুপতির আবার গানবাজনার ওপর খানিকটা টান আছে।

আমরা উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় দেখি পানুবাবু। কলকাতায় ঠাণ্ডা পড়েনি, তবু পানুবাবুর গায়ে একটা সুতির চাদর। ঘরে এলেন এমন ভঙ্গিতে মনে হল যেন অসুস্থ। মুখ থমথমে।

আমি ভাবলাম পানুবাবু বুঝি নিজেই প্রুফের তাড়া বয়ে এনেছেন।

"আসুন পানুবাবু! বসুন। বৃহস্পতিবার থেকে আমি প্রুফ পাচ্ছি না! কী ব্যাপার?"

পানুবাবু চেয়ারে বসলেন। বললেন, "আর প্রুফ? আপনারা কিছু শোনেননি?"

আমরা মাথা নাড়লাম। কিছুই শুনিনি।

পানুবাবু বললেন, "মহিমবাবু আর নেই।"

আমরা চমকে উঠলাম। মহিমবাবু মারা গিয়েছেন। সে কী! তাঁর তো বেশি বয়েস হয়নি। কোনো অসুখ-বিসুখ তাঁর ছিল বলে জানি না। শুধু চোখের ব্যাপারে তাঁর একটা অসুখ ছিল। কম দেখতেন। সন্ধের দিকে একরকম রাতকানাই হয়ে যেতেন।

পশুপতি বলল, "মারা গিয়েছেন? কবে?"

"কাল," পানুবাবু বললেন, "শুক্রবারে। কাল মহিমবাবু রোজকার মতন তাঁর দোকানে এসেছিলেন। কাজকর্মও করেছেন। স্কুল সিজনের কাজ চলছে বলে দোকান থেকে উঠতে উঠতে আটটা বেজে যায়। কর্মচারীরা দোকান বন্ধ করার পর মহিমবাবু রোজকার মতই তাঁর চেনা এক রিকশাঅলাকে ডেকে রিকশায় ওঠেন চেনা রিকশাঅলাদের কিছুই বলতে হত না। তারা মহিমবাবুকে বাড়ি পৌঁছে দিত। হাত ধরে নামিয়ে সদর পর্যন্ত এগিয়ে দিত। ...কাল যে রিকশাঅলা মহিমবাবুকে নিয়ে গিয়েছিল সে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যখন মহিমবাবুকে নামাতে গেল, দেখল রিকশার

একদিকে গা-মাথা হেলিয়ে তিনি পড়ে আছেন। কোনো সাড়া-শব্দ দিচ্ছেন না।"

আমি আঁতকে উঠে বললাম, "সে কী? রিকশাতেই?"

"হ্যাঁ। লোকজন, ডাক্তার-বদ্যি সবই এল। কিন্তু সব শেষ। বাঁচানোর কোনো চেষ্টাই করা গেল না।…আগেই মারা গিয়েছেন।

পশুপতি যেন হায় হায় করে উঠল। ইশ্! এভাবে মানুষ মারা যায়? হার্টফেল?"

"মহিমবাবুর হার্টের কোনো অসুখ ছিল বলে শুনিনি। উনি তো আমার অনেক পুরনো খদ্দের। বছর পনেরো ওঁর সঙ্গে কারবার করছি। বন্ধুর মতন হয়ে গিয়েছিলেন। ঘরের কথাও বলতেন। ওঁর দোষের মধ্যে দেখেছি একটু তিরিক্ষে ধরনের, ঠোঁটকাটা, আর খানিকটা কৃপণ। এ-ছাড়া ওঁর কোনো দোষ দেখিনি। বিয়ে-থা করেননি, ভাইপো ভাগ্নেদের মানুষ করেছেন।"

আমার ভাল লাগছিল না। পানুবাবুর কথা মন দিয়ে শুনছিলাম না সব। মহিমবাবুর সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা ভালই ছিল।

পানুবাবু বললেন, "সবচেয়ে বড় কথা হল মহিমবাবুর ডেথ সার্টিফিকেট পাওয়া যায়নি। ডাক্তার দিতে রাজি হয়নি। ফলে…।"

কথাটা আর শেষ করতে হল না পানুবাবুকে, পশুপতি আর আমি দুজনেই আঁতকে উঠে বললাম, "পোস্ট মর্টেম?"

"হ্যাঁ। আজ বডি দেয়নি। কাল রবিবার, কাল যদি দেয়। কী জানি!

"গোলমেলে কেস নাকি?" পশুপতি বলল।

"কেমন করে বলব?" পানুবাবু বললেন, "সুস্থ লোক, রিকশায় করে বাড়ি ফিরছে। রাস্তার মধ্যে হুট করে মারা যাবে, কে ভাবতে পারে। ডাক্তারও পারেনি। শুনলাম ডাক্তার নাকি বলেছেন, তিনি যখন পেশেণ্টকে দেখেছেন তখন পেশেণ্ট ডেড। কাজেই তিনি কোনো সার্টিফিকেট দিতে পারবেন না।"

আমরা কোনো কথা বললাম না। আবহাওয়াটা কেমন পালটে গেল পানুবাবুর মুখে দুঃসংবাদ শোনার পর থেকেই। মহিমবাবুর মুখ মনে পড়ছিল। তাঁর সেই সাদামাটা পোশাক, খদ্দরের পাঞ্জাবি আর মিলের ধুতি। চশমা পরতেন সাবেকি ধরনের।

পানুবাবু বললেন, "আজ সারাটা দিনই ঝঞ্ঝাটে ছিলাম। বাড়ি ফেরার পথে ভাবলাম, আপনারা হয়তো খবরটা জানেন না। খারাপ খবর, তবু জানিয়ে যাই।"

পশুপতি বলল, "ভাল করেছেন। আমরা কিছুই জানতাম না। জানলে মহিমবাবুর বাড়িতে যেতাম। কাল একবার যাব।"

পানুবাবু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকার পর এক গ্লাস জল খেতে চাইলেই।

পশুপতি জল আর চায়ের জন্যে হাঁক মারল।

মাথা নাড়লেন মহিমবাবু, "না, চা আর খাব না। অনেকবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে।" বলে উনি আমার দিকে তাকালেন। তাকালেন "আপনার কাজকর্ম এখন বন্ধ রাখব কি না বুঝতে পারছি না। এই অবস্থায় বইটা শেষ করে দিয়ে লাভ হবে বলে মনে হয় না। আবার ভাবছি, সামান্য দুটো ফর্মা আটকে রেখেই বা কী হবে! শেষ হয়ে গেলে তবু অন্তত ছাপা ফর্মাগুলো থাকবে। আপনি কী বলেন জীবনবাবু?"

আমি বললাম, "লেখা আমি আজ শেষ করে দিয়েছি। ভাবছিলাম নিধু এলে তার হাতে শেষ কপিটা দিয়ে দেব।

"নিধু? কোথায় সে?" পানুবাবু বললেন, । "সে তো আসছে না ক'দিন?"

"বুধবার এসেছিল। আমি তাকে বসিয়ে রেখে খানিকটা প্রুফ দেখে দিয়েছিলাম। কপিও দিয়েছিলাম পাতা-কুড়ি।"

"সে কী! সেই প্রুফ তো সে ফেরত দেয়নি। কপিও না।" পানুবাবু কপাল চুলকোলেন। "আপনাকে প্রেস থেকে বোধ হয়

বারো-চোদ্দ গেলি প্রুফ পাঠানো হয়েছিল দ্বিতীয় বারে। সে প্রুফ আমরা ফেরত পাইনি।"

জল এসেছিল।

পানুবাবু জল খেলেন।

"আমি তা হলে উঠি পশুপতিবাবু।" পানুবাবু, উঠে দাঁড়ালেন। তারপর হঠাৎ বললেন, "মনে মনে একটা ভয় হয়ে গেছে, মশাই। কে জানে এই হয়তো শেষ জল খাওয়া! না না, অবাক হবেন। না। এইরকম হয়। মহিমবাবু রিকশায় উঠে একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন খাবেন বলে! সিগারেটটা আর খেতে পারেননি। মুখ থেকে পড়ে গিয়েছিল কোলে। শুনলাম জামাটা সামান্য পুড়ে গিয়েছিল। এই তো মানুষের জীবন। এক মুহূর্ত আগে আছে, পরের মুহূর্তে নেই।"

হঠাৎ যেন আমার বুকের ওপর বিরাট কোনো ঘা লাগল। মাথার মধ্যে কী যেন হয়ে গেল। গলা বন্ধ-বন্ধ হয়ে আসছিল। "কী বললেন? কোলের ওপর সিগারেট? পোড়া সিগারেট?

"হ্যাঁ। শুনেছি প্রায় গোটা সিগারেট।"

আমি যেন ভূত দেখার মতন চোখ করে পানুবাবুকে দেখতে লাগলাম।

পানুবাবু আর দাঁড়ালেন না, চলে গেলেন।

*　　*　　*

পানুবাবু চলে গেলে আমি বেহুঁশের মতন বসে থাকলাম। সবই কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল। এমন কি হয় নাকি? গল্পের ঘটনার সঙ্গে জীবনের ঘটনা মিলে যায়? আশ্চর্য!

"পশুপতি?"

"বল?"

"এ কেমন করে হল? আমি যে বইটা সবে শেষ করলাম, তাতে একেবারে এই জিনিস?"

পশুপতি কিছুই বুঝতে পারল না। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

"অদ্ভুত ব্যাপার। স্ট্রেঞ্জ! আমি ভাবতেই পারছি না। একেবারে এক ধরনের মার্ডার।" আমার গলার স্বর নিজেরই কানে লাগল। ভয় পেয়েছি, না উত্তেজিত হয়ে উঠেছি। চোখকান জ্বালা করে উঠছিল।

পশুপতি বলল, "কী বলছিস পাগলের মতন। একই ধরনের মার্ডার মানে।"

"একই ধরনের। সেম। তুই তোকে আমি একটা খুনের কথা লিখেছিলাম। একটা সত্তর বছরের বুড়ো, অগাধ তার সম্পত্তি, হাড়কেপ্পন। তাকে তাঁর ভাইপো এইভাবে খুন করবে; সিগারেটের পাতার মধ্যে বিষ মেশানো থাকবে। বুড়ো দুটো-তিনটে টান মারার সঙ্গে সঙ্গেই শেষ।"

পশুপতি আমার দিকে বোকার মতন তাকিয়ে থাকল। "বুঝলাম না!" পশুপতি বলল, "তোর গল্পের বুড়ো যেমন ভাবেই মরুক—তার সঙ্গে মহিমবাবুর সম্পর্ক কী!"

"তুই বুঝতে পারছিস না! তুই কী রে! মহিমবাবুকেও তো একইভাবে মারা হয়েছে।"

পশুপতি হেসে উঠল। "তোর মাথা। কোথায় তোর বইয়ের গল্প আর কোথায় রিয়েল ব্যাপার!"

"তুই বিশ্বাস করছিস না! আমি সত্যি বলছি, আমার গল্পে আমি একটা নতুন ধরনের মার্ডার ঢুকিয়েছিলাম। মানে, এমনভাবে খুন করা হবে যাতে বাইরে থেকে কিছু বোঝা যাবে না। মনে হবে হাট অ্যাটাক বা হার্ট ফেল। তুই ভেবে দ্যাখ, এখানেও তাই করা হয়েছে। মহিমবাবু সুস্থ অবস্থায় রিকশায় উঠে বাড়ি ফিরছিলেন। দোষের মধ্যে তিনি একটা সিগারেট ধরিয়েছিলেন। দু' চারটে টানও দিতে পেরেছিলেন কিনা কে জানে! হাত থেকে সিগারেট গড়িয়ে পড়ল, তিনিও ঢলে পড়লেন রিকশায়।"

পশুপতির এতক্ষণে যেন মাথায় গেল আমি কী বোঝাতে চাইছি। আমার দিকে তাকিয়ে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, "তোর এই নতুন বইটায় এরকম ছিল!"

"হ্যাঁ।"

"তুই কি বলতে চাইছিস তোর বইয়ের গল্পের সঙ্গে মহিমবাবুর মারা যাবার সম্পর্ক আছে?"

"তা জানি না, ভাই। তবে বড় অদ্ভুত লাগছে। আমার লেখার প্রুফ আজ তিন দিন ধরে পাচ্ছি না। নিধু বেপাত্তা। অথচ এই রকম একটা কাণ্ড হয়ে গেল।"

পশুপতি হাত তুলে আমায় চুপ করতে বলল। বলে কী যেন ভাবতে লাগল। খানিকক্ষণ পরে বলল, "দাঁড়া, ব্যাপারটা বুঝতে দে। তুই কি বলতে চাস তোর গল্পের খুন দেখে, বা ধর পড়ে, কেউ একজন মহিমবাবুকে খুন করেছে?"

"তাই তো দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা।"

"দাঁড়াচ্ছে বললেই হবে নাকি? যুক্তি কোথায়?"

আমি বললাম, "তুই ভেবে দেখ না!...পানুবাবুর মুখেই শুনলি—আমার দেখে দেওয়া প্রুফ তাঁর প্রেসে পৌঁছয়নি। নিধু পৌঁছে দেয়নি। সে প্রেসে যাচ্ছে না।"

"এ-থেকে কিছুই প্রমাণ হয় না। তোর কাছে যে কপি আর প্রুফ এসেছিল, তুই দেখে দিয়েছিস বলছিস' সেটাতে কী ছিল?"

"এইরকম খুনের কথা।"

"একেবারে গোড়াতেই ছিল?"

"হ্যাঁ। গোড়ার দিকেই।"

"তুই কি লেখায় বিষের নাম দিয়েছিলি?"

"হ্যাঁ।

"পুরো নামটা আমার নোট বইয়ে লেখা আছে। এক ধরনের শ্যাওলার মতন জিনিস। দক্ষিণ আমেরিকার কোথাও কোথাও পাওয়া যায়। সমুদ্রের কাছে সাধারণত। এখানে এ বিষ পাওয়া

কেমন করে। একটা ইংরেজি বইতে ব্যাপারটা দেখেছিলাম। দেখে নোটখাতায় টুকে নিয়েছিলাম।”

“এই বিষে কাজ হয়?”

“তার আমি কী জানি! বইয়ে দেখেছিলাম, টুকে নিয়েছিলাম। হাতেকলমে তো পরীক্ষা করে দেখিনি। তাছাড়া গল্পের বইয়ে লেখা বিষ নিয়ে কে আর মাথা ঘামায়!”

পশুপতি মাথার চুল ঘাঁটতে লাগল। কী ভাবছিল কে জানে। সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, “তোর খানিকটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে জীবন। আমার মনে হয় না, তোর গল্পের বই থেকে কেউ খুন করার ব্যাপারটা শিখে নিয়েছে। এ-রকম কখনো শুনিনি। তাই যদি হত তবে শয়ে-শয়ে হাজারে-হাজারে গোয়েন্দা বই যা বেরোয় বাজারে—তার থেকে লোকে খুনখারাপি শিখে নিত। গল্পের গোরু কি আর গেছো হয়!’

পশুপতি যা বলছিল তা আমিও বুঝি। গোয়েন্দা বই পড়ে কেউ খুন শেখে না। কিন্তু এই ব্যাপারটায় এমন আশ্চর্য মিল ঘটে গেল বলেই আমার আতঙ্ক হচ্ছিল।

পশুপতি বলল, “শোন, কতকগুলো সহজ যুক্তি সাজিয়ে নে। প্রথম যুক্তি হল, মহিমবাবু আচমকা মারা গিয়েছেন এটা ঠিকই, কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ কি বলেছে ওঁকে খুন করা হয়েছে? হুট্ করে মানুষ মরতেই পারে। মহিমবাবুর হয়তো হার্টের রোগ ছিল, বা হয়েছিল, তিন জাননে না, আমরাও জানতাম না।”

“ডাক্তার ডেথ্ সার্টিফিকেট দেয়নি।”

“না দেওয়াই স্বাভাবিক। না জেনে কোন্ ডাক্তার সার্টিফিকেট দেয়!’

“পোস্ট মর্টেম হচ্ছে—শুনলি তো?”

“অস্বাভাবিক মৃত্যু হলে সেটা হয় বলেই শুনেছি। তুই একটা দিন অপেক্ষা কর না। কালকেই হয়তো জানতে পারবি। রিপোর্ট পেলেই সব শোনা যাবে।”

"অপেক্ষা তো করতেই হবে। কিন্তু আমার কেমন মনে হচ্ছে, পশুপতি। ভাল লাগছে না। দুশ্চিন্তা করছিস! যা ঘটেছে সেটা কাকতালীয়। তুই নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাক।"

হয়তো পশুপতির কথাই ঠিক। যা ঘটেছে সেটা কাকতালীয়। এমনও হতে পারে, আমি যা ভাবছি ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। মহিমবাবু হার্টের রোগেই মারা গিয়েছেন। এ-রকম হামেশাই হয় আজকাল, অফিসে কাজ করতে করতে মানুষ মারা যায়, খবরের কাগজ পড়তে পড়তে লুটিয়ে পড়ে, চায়ের কাপ মুখে তোলার অবসর পায় না, চিরকালের মতন চোখ বোজে। হ্যাঁ, এ-রকম হয়। তবু আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে কেন?

পশুপতি বলল, কথা ঘোরাবার জন্যেই, "তোর গল্পে কী ছিল রে?"

"গল্পে?"

"হ্যাঁ।"

"বললাম তো! একটা বুড়োকে তার ভাইপো খুন করবে।"

"একটু ছড়িয়ে বল। কেমন করে করবে, মানে কীভাবে?"

"বুড়োকে বিষ মেশানো সিগারেট দেবে খেতে। বুড়ো বুঝতে পারবে না। আসলে একটা প্ল্যান করা হয়েছিল বুড়োকে মারার জন্যে। বুড়ো সব ব্যাপারেই খুব সাবধানী ছিল, সন্দেহও করত এক ভাইপোকে। কিন্তু যখন সে খুন হয়—তার কিছু ভুল হয়েছিল।"

"কী ভুল হয়েছিল?"

"প্রথম ভুল, সে ধরতেই পারেনি—তার চশমাজোড়া যে ভেঙে ফেলল—মানে তার চাকর ভেঙে ফেলেছিল, সেটার একটা উদ্দেশ্য ছিল। তার ভাইপো বুড়োর চাকরকে দিয়ে এটা করেছিল। চশমা না থাকায় বুড়ো বুঝতে পারেনি, কখন তার সিগারেটের প্যাকেট বদল করে অন্য প্যাকেট রাখা হয়েছে। তৃতীয় ভুল, বুড়ো হাড়কিপ্টে বলে বাড়ির বারান্দায় প্রায় অন্ধকারেই বসে ছিল। আলো জ্বালেনি। রাস্তার আলোতেই বসে বসে আরাম করছিল।"

পশুপতি বলল, "মহিমবাবুর চশমা কিন্তু কেউ ভাঙেনি।"

"হ্যাঁ। তবে মহিমবাবুর চোখের দোষ ছিল বড় রকমের। তিনি এক রকম রাতকানা ছিলেন।"

"তা অবশ্য ঠিক। তবে তাঁকে তো দোকানের কর্মচারীরাই সিগারেট কিনে এনে দিত। তারা সকলেই পুরনো কর্মচারী। বিশ্বস্ত।"

"বিশ্বস্ত লোক কি অবিশ্বাসের কাজ করে না?"

"টাকাপয়সা খেয়ে করতে পারে।"

"অনায়াসে পারে। তাছাড়া, মহিমবাবুর দোকানের কমচারীরা সবাই ধর্মপুত্তুর একথা কে বলল? আমরা তাদের কতটুকু জানি।"

পশুপতি অস্বীকার করল না।

বাস্তবিক পক্ষে আমরা মহিমবাবুর দোকানের মাঝে মাঝে গিয়েছি, চা খেয়েছি, কথাবার্তা বলেছি সামান্য। ভদ্রলোক যে খারাপ ছিলেন তা নয়, তবে সদালাপী ছিলেন না। বসে বসে গল্প করার মতন মানুষও নন। কাজের কাজটুকু সেরে তিনি আমাদের বিদায় জানাতেন।

মহিমবাবুর দোকানে চার-পাঁচজন কর্মচারী দেখেছি। মুখে সকলকেই চিনি। কারও নাম জানি, কারও শুধু পদবীটা। কর্মচারীদের মধ্যে গৌরাঙ্গবাবু সবচেয়ে পুরনো। তিনি বয়স্ক লোক। বিক্রিবাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন গৌরাঙ্গবাবু আর রায় বলে এক ছোকরা। অন্য দু'জনের মধ্যে ছিল কানু বলে এক লম্বা সিড়িঙে আধবয়েসী লোক আর মল্লিক নামের এক জোয়ান ছেলে। মাঝে-সাঝে দাশু বলে একজনকে দেখেছি।

এদের কারও সঙ্গে আমাদের পরিচয় তেমন গভীর ছিল না। গৌরাঙ্গবাবু অবশ্য সজ্জন মানুষ।

আমি বললাম, "খারাপ না হলেই ভাল। তবু বলছি, নিধুর ব্যাপারটা আমার ভাল লাগছে না। সে বেপাত্তা হবে কেন?"

"খোঁজ করবি ?"

"ভাবছি।"

"বেশ, কর। আমি তোর সঙ্গে থাকব।"

*   *   *

সকালের দিকেই পশুপতির ঝামেলা বেশি থাকে। বাজার-হাট, মুদিখানা, কয়লা-ঘুঁটে, কে এল কে গেল—টাকা পয়সার হিসেব আদায়পত্র, এসব নিয়ে ব্যস্ত থাকে বেলা পর্যন্ত।

আমার তর সইছে না দেখে পশুপতি বারো আনা কাজ দশটা নাগাদ মিটিয়ে দিয়ে বলল, "নে চল। আমি তৈরি।"

রাস্তায় বেরিয়ে পশুপতি বলল, "তোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে রাত্তিরে ঘুমোতে পারিসনি ?"

সত্যিই রাত্রে ঘুমোতে পারিনি। মাথার মধ্যে ওই একই চিন্তা জট পাকিয়ে গিয়েছিল! মহিমবাবুর মুখ বার বার মনে পড়েছে। বেচারি! পানুবাবু, প্রেস, নিধু—প্রত্যেকের কথাই ভেবেছি কাল।

পানুবাবুর প্রেস বিবেকানন্দ রোডের দিকে। বড় রাস্তায় নয়, গলির মধ্যে।

আমরা দু'জনে হাঁটতে লাগলাম। কলেজ স্ট্রীটের মুখে এসে ট্রাম ধরব।

পশুপতি বলল, "তুই খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিস যেন!"

"না।" মিথ্যে কথাই বললাম পশুপতিকে। আসলে আমায় ভয়ে ধরেছিল।

"তোর মুখ বলছে তুই ভয় পেয়েছিস," পশুপতি বলল, "তোর ভয়, পুলিশ তোকে ধরবে! বলবে, জীবনলালবাবু, আপনি মশাই মহিমবাবুকে খুন করার পথটা দেখিয়েছেন। আপনাকে ছাড়া হবে না।···সত্যি তুই জীবন একটা গাধা। পুলিশের আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই, তোকে ধরতে আসবে।" পশুপতি হাসতে লাগল।

আমি বললাম, "বাঘে ছুলে আঠারো ঘা। পুলিশ যদি ছোঁয়—আমায় নাজেহাল করে ছাড়বে। আমি ভাই পুলিশকে ভয় পাই।"

"তাহলে আর ডিটেকটিভ বই লিখিস না। ভূতের গল্প লেখ।"

কথা বলতে বলতে আমরা মোড়ে এসে পড়েছিলাম। ট্রাম আসছিল।

রবিবার। প্রেস বন্ধ। আমরা ভেবেছিলাম, এখন কাজের চাপ চলছে—হয়তো খোলা থাকতে পারে।

দরোয়ান রামলাল বলল, গত রবিবার কাজ হয়েছে। এ-রবিবার কাজ হয়েছে। এ-রবিবার কেউ আর কাজ করতে চায়নি, তাই ছুটি।

পশুপতি বলল, "নিধুর ঠিকানাটা জেনে নে, জীবন।"

দারোয়ান আমাদের চেনে। আমাকে হামেশাই দেখে প্রেসে আসতে। "রামলাল, ওই নিধু কোথায় থাকে? ঠিকানা জানো?"

রামলাল একটু ভাবল। মাথা নাড়ল। বলল, "পাত্তা আমি জানি না, বাবু। মগর ও মেটিয়া কলিজের পাস থাকে।"

"গলির নাম?'

"মালুম নেহি।'

পশুপতি আমার দিকে তাকাল। বলল, "কাল পানুবাবুকে জিজ্ঞেস করে নিলেই হত।'

"তখন আনার এত কথা মনেও আসেনি।···তাছাড়া, এখনও পানুবাবুকে ব্যাপারটা না বলা ভাল। আগে থাকতে রটিয়ে লাভ কী! দেখা যাক—কী হয়।"

রামলাল নিজেই বলল, "আপলোগ দাশুবাবুসে পুছে লিন, দাশুবাবু জানেন।'

"কোথায় থাকেন দাশুবাবু!"

"নাগিচ, এহি গলিসে চলে যান। বাঁয়া মোড় লেবেন। সাত নম্বর।"

"আচ্ছা!"

আমরা আর দাঁড়ালাম না, দাশুবাবুর খোঁজে চললাম।

যেতে যেতে পশুপতি বলল, "তুই দাশুবাবুকে চিনিস!"

"হ্যাঁ, হেড কম্পোজিটার।"

"চল—দেখি।'

বাড়ি খুঁজে পেতে দেরি হল না, দাশুবাবুকে খুঁজে পেতেই দেরি হল। সেকেলে এক বৃহৎ বাড়ি, তারই খোপে খোপে অজস্র ভাড়াটে

দাশুবাবু বললেন, "মেডিকেল কলেজের মেন গেটের উলটো দিকে যে গলিটা—ওই গলি দিয়ে ঢুকে যাবেন। শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। বাড়ির নম্বর মনে পড়ছে না। জানি না। বছরখানেক আগে একবার গিয়েছিলাম। একটা মুদির দোকান দেখবেন। জিজ্ঞেস করলে বলে দেবে।" বলে দাশুবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, "নিধুর নাকি কোন্ মাসি মারা গিয়েছে। খবর পাঠিয়েছিল। ওর মা-মাসি কেউ আছে বলে আমি জানি না। কামাই করার অজুহাত। ছেলেটা দিন দিন বদ হয়ে যাচ্ছে জীবনবাবু। নেশাভাঙ করে বেড়ায় শুনেছি"

আমি আসল কথাটা ভাঙলাম না। বললাম, "যাই, একবার খোঁজ করে দেখি গে। পানুবাবু কাল গিয়েছিলেন। বললেন, আমার প্রুফ আটকে পড়ে আছে। প্রুফ তো আমার কাছে নেই নিধুর কাছে। সে যে কী করল, কাগজপত্র হারাল না বাড়িতেই ফেলে রেখেছে—একবার খোঁজ নেওয়া দরকার।"

দাশুবাবু বললেন, "গিয়ে দেখুন কী করল প্রুফগুলোর! দায়িত্ব বলে কিছু নেই ওর। ওদের দিয়ে কাজ হয় না। কী বলব বলুন! বাবু ভাল মানুষ চাকরিটা তো খাবেন না। আশকারা পেয়ে পেয়ে মাথায় উঠেছে।...মহিমবাবুর কথা শুনেছেন?

শুনেছি। পানুবাবুই বলেছেন।"

"নিয়তি। কপালে কার কী আছে কে জানে!

আমরা আর দাঁড়ালাম না।

ফিরে এসে আবার ট্রাম ধরার জন্যে দাঁড়িয়ে আছি, পশুপতি বলল, "নিধু বেশি দেখেছিল।"

"ছেলেটাকে তো খারাপ দেখিনি, তবে চেহারাটা কেমন চোয়াড়ের মতন হয়ে গেছে আজকাল।"

"নেশাটেশা করে বলল!"

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

ট্রাম এল। বেশ ফাঁকা।

আমরা পাশাপাশি বসলাম। ট্রাম চলতে শুরু করলে আমি বললাম, "তুই মহিমবাবুর ফ্যামিলির খবর রাখিস?"

"না। ওপর ওপর যা শুনেছি।"

"আমি ভাবছি, মহিমবাবুকে খুন করলে কার কী লাভ হতে পারে। কার স্বার্থ?

পশুপতি বলল, "আমার কিন্তু একবারও মনে হচ্ছে না, এটা খুনের ব্যাপার। ভদ্রলোক হার্টের রোগেই মারা গেছেন।"

"তোর কথা সত্যি হলেই ভাল।" বলে আমি রাস্তার দিকে মুখ ফেরাতেই দেখলাম, আমাদের মেসের বিজনদা, রিকশায় চেপে কোথায় যেন যাচ্ছেন। আজই আমার মেসে ফেরার কথা ছিল।

নিধুকে পাওয়া গেল না সে নাকি সকালের দিকে বেরিয়ে। গিয়েছে। কখন ফিরবে কেউ জানে না।

নিধু যে-বাড়িটায় থাকে তাকে বাড়ি বলা যায় না। দপ্তরিখানা বললেই ঠিক বলা হয়। ছোট ছোট দুখানা ঘর, সামান্য বারান্দা। কাগজ-ছাঁটাই মেশিন, রাজ্যের ছাঁট কাগজ, পেস্ট-বোর্ড, কাঠের ডেস্ক, দুর্গন্ধে ভরা লেই—আরও কত কী পড়ে আছে।

দুটো লোক কাজ করছিল। বলল, তারা কিছু জানে না।

মুদির দোকানের লোকটাকেই ধরতে হল আবার। বলল, "রাত আটটা নাগাদ আসুন। ওই সময় দেখা পেতে পারেন।"

"ও কি বাড়িতে থাকে?"

"থাকে। তবে আজ ক'দিন দেখছি রাত করে ফেরে।"

"বাঁধাইখানাটা কার?"

"মণ্ডলবাবুর।"

পশুপতি আমার হাত ধরে টানল। বলল, "চল এখন। পরে দেখা যাবে।"

* * *

সকালটা বৃথা গেল। দুপুরটাও।

পশুপতি বলেছিল, চল বিকেলে একবার মহিমবাবুর বাড়ি থেকে দেখা করে আসি।

আমি রাজি হইনি। কেমন একটা ভয় করছিল। ও-বাড়িতে গিয়ে কী দেখব, কী শুনব কে জানে! যদি পোস্টমর্টেম হয়ে গিয়ে থাকে—তাহলে মন্দ খবরও তো শুনতে পারি। আমি বললাম, আগে নিধুকে ধরি, দেখি ব্যাপারটা কী তারপর যাব।

বিকেল শেষ হল। আজকাল তাড়াতাড়ি বিকেল ফুরোচ্ছে। ছ'টা নাগাদ একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল।

এক একসময় মনে হচ্ছিল, আমি পাগলামি করছি। মহিমবাবুর মারা যাবার সঙ্গে প্রেসের এক সাধারণ কর্মচারী নিধুর কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে না। আমি অকারণ এক অসম্ভবের সঙ্গে নিধুকে জড়াতে চাইছি।

আবার মনে হচ্ছিল, যতই অসম্ভব হোক—একবার নিধুর খোঁজ নিতে আপত্তি কোথায়? নিধুর আচরণে সন্দেহ করার মতন বিশেষ কিছু নেই হয়তো, তবু দু'একটা জিনিস থেকে সামান্য সন্দেহ হয়। নিধু কেন ক'দিন প্রেসে যাচ্ছে না? কেন সে মিথ্যে কথা বলে কামাই করছে? আজ ক'দিন সকালের দিকে সে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন? কী জন্যে রাত করে ফিরছে? সে কবে থেকে নেশা ভাঙ শিখল?

খুঁটিয়ে ভাবলে সন্দেহটা বাড়ে বই কমে না। আবার অন্যদিক থেকে বিচার করলে, প্রেসের নিধুর সঙ্গে বইয়ের দোকানের মালিক মহিমবাবুর কোনো সম্পর্কই খুজে পাওয়া যায় না।

আটটা বাজার খানিক আগেই পশুপতি আর আমি বেরিয়ে পড়লাম।

পশুপতি বলল, "মহিমবাবুদের বাড়িতে একটা ফোন করলে হত। তুই নম্বর জানিস?"

"না। আমি দোকানের নম্বর জানি।"

"টেলিফোন ডাইরেক্টরিতে পেয়ে যেতাম। ফিরে গিয়ে করব।"

আমরা হাটতে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের কাছাকাছি পৌঁছলাম যখন, তখন আটটা বেজে গিয়েছে।

মুদির দোকানের ঝাঁপ বন্ধ। দপ্তরিখানার দরজাও।

আমি কড়া নাড়ালাম।

কোনো সাড়াশব্দ নেই। ভেতরে আলো জ্বলছে বোঝা যাচ্ছিল।

আবার কড়া নাড়তে ভেতরে থেকে সাড়া এল। "কে?"

গলার স্বরটা নিধুর বলে মনে হল না।

পশুপতি নিচু গলার বলল, "আমার নাম বল।"

কারও নাম বলতে হল না, দরজা খুলে গেল।

জায়গাটা অন্ধকার মতন, তবু যে দরজা খুলল—তাকে চিনতে পারলাম না। লোকটার বয়েস বেশি নয়। মনে হল, আমাদের বয়সী লোকটা আমাদের দেখল। বলল, "কী চাই? ওর গলার স্বর রুক্ষ।

"নিধু আছে?"

"কে? কে নিধু?

পশুপতি আমার গায়ের পাশে গা দিয়ে দাঁড়াল। বলল, "এ-বাড়িতে নিধু বলে কেউ থাকে না।"

"নিধু এ-বাড়িতেই থাকে। আমরা প্রেস থেকে ঠিকানা নিয়ে ও-বেলা দেখা করতে এসেছিলাম।

"প্রেস!...ও আপনারা নিমাইসাধনের কথা বলছেন! সে তো আজ ক'দিন হল দেশে চলে গিয়েছে।

পশুপতি আমার দিকে তাকাল। আমি পশুপতিকে দেখলাম। লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। ডাহা মিথ্যে

পশুপতি বলল, "ক'দিন মানে। সকালে এসে শুনলাম, নিধু ভোর-ভোর বেরিয়ে গেছে আর আপনি বলছেন সে নেই?"

"হ্যাঁ নেই। যান, ঝামেলা পাকাবেন না।"

"আপনি এ-বাড়িতে থাকেন?"

"না। লোকটা বিরক্ত হল। তার চেহারাটা ষণ্ডামার্কা। মাথা-ভর্তি চুল। গায়ে স্পোর্টস গেঞ্জি।

পশুপতি একসময় মারকুটে ছেলে ছিল। রাস্তাঘাটে চড়চাপড় ঘুষি চালাত। আজকাল তার ওসব দোষ নেই। লোকটার বেয়াড়াপানা, তাচ্ছিল্যের ভাব, মস্তানি দেখে পশুপতি ভেতরে ভেতরে চটছিল। সে যে চটছিল, আমি বুঝিনি। বুঝলাম—পশুপতি যখন দ্বিতীয় কোনো কথা না বলে আচমকা দরজা ঠেলে নিজের শরীরের অর্ধেকটা ঢুকিয়ে দিল।

লোকটা এ-রকম আশা করেনি, থতমত খেয়ে গিয়েছিল।

পশুপতি ভেতর দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে বলল, "নিধু, আমি আর জীবনবাবু তোমার কাছে এসেছি। দরকারি কথা আছে। তুমি যদি না বেরিয়ে এসে দেখা করো, আমরা কিন্তু সোজা থানায় যাব। মহিমবাবু মারা গেছেন।"

লোকটা আচমকা পশুপতিকে ধাক্কা মারল। পশুপতি সামলাতে পারল না। পড়ে গেল। আমি দরজার পাশে, তখনও বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পশুপতিকে ধাক্কা মেরে মাটিতে ফেলে দিয়েই লোকটা ছুটল। পালাল।

এত দ্রুত এবং সহসা সব কিছু ঘটে গেল যে, আমরা কিছু বুঝতে পারলাম না, করতেও পারলাম না।

পশুপতি উঠে দাঁড়াল।

"লোকটা পালিয়ে গেল," আমি বললাম, "লেগেছে তোর?"

* আমি দরজা পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। পশুপতিকে ধাক্কা মেরে লোকটা ছুটে পালাল।

"না। তুই বেটাকে ধরতে পারলি না?

"বুঝতেই পারিনি।"

"যাক গে।" পশুপতি ছোট্ট উঠোনটুকু পেরিয়ে যেতে যেতে বলল, "দরজা বন্ধ করে দে। ভেতরে আয়।"

দরজা বন্ধ। দপ্তরিখানার মেশিনপত্র যেমন ছিল পড়ে আছে বারান্দায়। সকালের তুলনায় সামান্য সাফ-সুফ।

পশুপতি আবার ডাকল, "নিধু, বাইরে এসো।"

কোনো সাড়া নেই।

দুটো ঘরের একটা বন্ধ ছিল বাইরে থেকে, অন্যটা ভেতর থেকে। দুটো ঘরই অন্ধকার।

এবার আমি নিধুকে ডাকলাম। ধাক্কা দিলাম দরজায়। তবু কোনো সাড়াশব্দ দিল না নিধু।

শেষে পশুপতি বলল, "তোমাকে এই শেষবার বলছি নিধু। বাইরে এসো। যদি না বেরিয়ে আসো, আমরা কিন্তু এবার সোজা থানায় যাব। তুমি ভেবো না, আমরা দু'জনেই একসঙ্গে থানায় যাব। আমি এখানে তোমাকে আটকাব। জীবনবাবু থানায় যাবেন।"

আমরা সামান্য অপেক্ষা করতেই ভেতর থেকে দরজা খোলার শব্দ এল। তারপর নিধু বেরিয়ে এল। অন্ধকারেও বোঝা যাচ্ছিল তার চেহারা, পোশাক সবই যেন কেমন নোংরা বিশ্রী দেখাচ্ছে।

নিধু বাইরে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। কথা বলল না।

পশুপতি বলল, "তুমি ঘরের মধ্যে লুকিয়ে ছিলে কেন? আমরা ডাকছি, শুনতে পাচ্ছিলে না?"

কোনো জবাব দিল না নিধু।

আমি বললাম, "তোমার কাছে আমরা কেন এসেছি জানো?"

মাথা নাড়ল নিধু। জানে না।

"মিথ্যে বোলো না, তুমি জানো?"

"না বাবু।"

"তুমি আবার মিথ্যে কথা বলছ। তুমি জানো, মহিমবাবু মারা গেছেন?"

"শুনেছি।"

"কে বলেছে?"

"ফুলুবাবু।"

"ও কে? কী করে? কোথায় থাকে?"

নিধুর যে ভয় ধরে গিয়েছে, স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। নিধু বলল, "ফুলুবাবু এই দপ্তরিখানার মালিকের বন্ধু। মালিক হলেন মণ্ডলবাবু। এই দপ্তরিখানায় মহিমবাবুর দোকানের তিন-চারটে বই বাঁধাই হয়। আমি এখানে থাকি। মণ্ডলবাবু আমায় থাকতে দিয়েছেন। রাতে দপ্তরিখানা পাহারা দিই।"

"ফুলুবাবু কী করে?"

"জানি না বাবু শুনেছি ফুলুবাবু ট্যাক্সি কিনেছে।...ফুলুবাবু মাঝেমাঝেই এখানে আসেন। মণ্ডলবাবুর সঙ্গে গল্পগুজব করেন।"

পশুপতি বলল, "ও!...তা তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করি। তুমি কাজ করো পানুবাবুর প্রেসে। ফুলুবাবু ট্যাক্সির মালিক। তোমাদের মধ্যে বইয়ের দোকানের মালিক মহিমবাবুকে নিয়ে কথা হবে কেন হে? ও কেন তোমাকে মহিমবাবুর মারা যাবার খবর শোনাবে?"

নিধু চুপ। জবাব দিতে পারছিল না।

আমি হঠাৎ বললাম, "নিধু, তুমি কথা লুকোচ্ছ। সত্যি করে সব কথা বলো। নয়তো তোমার বিপদ হবে।"

নিধু প্রথমে চুপচাপ। তারপর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, "বাবু, ফুলুবাবুর মহিমবাবুর নিজের লোক। বড় বোনের ছেলে। ভাগ্নে। ফুলুবাবু আগে তাঁর মামার দোকানে বসতেন। দোকানের টাকা পয়সা চুরি করার জন্যে মামা ফুলুবাবুকে একদিন নাকি জুতোপেটা করে দোকান থেকে বার করে দেন। সেই থেকে ফুলুবাবু মামার ওপর খাপ্পা।"

পশুপতি আমার দিকে তাকাল। বলল, "ব্যাপারটা একটু ধরা যাচ্ছে যেন রে। কিন্তু মহিমবাবুর ভাইপো ভাগ্নে শুনেছি বেশ কয়েকজন। মামা মরলে ফুলুর লাভ কী?"

কী লাভ তা আমিও জানি না। মামার অবর্তমানে কী পাবে ফুল?

আমি নিধুকে বললাম, ফুলুবাবুর কথা থাক। এবার তুমি অন্য কথার জবাব দাও।" বলে আমি একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দরজার দিকটা দেখলাম। "তুমি ক'দিন কাজে কামাই করছ কেন?"

নিধু জবাব না দিয়ে চোখ মুছতে লাগল।

"তুমি নাকি বলে পাঠিয়েছ, তোমার মাসি মারা গেছে। দাশুবাবু বললেন, তোমার মা-মাসির কথা উনি শোনেননি। তুমি মিথ্যে কথা বলেছ।"

নিধুর আবার কান্না এসে গেল। বলল "হ্যাঁ বাবু।"

"কেন?···

"ফুলুবাবু আমাকে দিয়ে একটা কাজ করাচ্ছিলেন!"

"কী কাজ!"

"আমাকে তিনি একটা চাবি দিয়ে দিতেন। আর বলতেন রাজাবাজারে অমুক জায়গায় যাবে, খিদিরপুরে তমুক জায়গায় যাবে আমি রোজ ফুলুবাবুর কথামতন রাজাবাজার, খিদিরপুর, ট্যাংরা, চেতলা, যাদবপুর যেতাম। উনি আমায় পঞ্চাশটা করে টাকা দিতেন।"

পশুপতি বলল, "চাবি দিতেন কেন? তুমি কাদের কাছে যেতে?"

"যাদের কাছে যেতাম বাবু, তারা ভাল লোক নয়। তারা খারাপ খারাপ নেশা বিক্রি করে লুকিয়ে। অচেনা লোককে তারা কিছু দেয় না কথাও বলে না। চাবি দেখলে তারা বুঝতে পারত, কোনো চেনা খদ্দের লোক পাঠিয়েছে! তবু তারা সন্দেহ করত। ঘোরাত।"

"তুমি কি কোনো বিষ এনেছিলে? না, ফুলুবাবুর নেশা আনতে?"

নিধু চুপ। তারপর ডুকরে উঠল। বলল, "আমায় কেউ কিছু দিত না। সন্দেহ করত। একটা লোক শুধু হোমিওপ্যাথির ছোট্ট শিশিতে কী একটা জিনিস দিয়েছিল। বলেছিল সাবধানে রাখতে। প্রথম দিন দেয়নি। বলেছিল, দুশো টাকা নিয়ে যেতে। ফুলুবাবু টাকা দিলে আমি পরের দিন গিয়ে এসেছিলাম।"

"সেটা কী?"

"জানি না বাবু।"

"কেমন দেখতে?"

"কালচে মতন। গুঁড়ো।"

"ফুলুবাবু সেটা নিয়ে কী করেছিল?"

"আমি জানি না।"

"তুমি কবে ওটা এনেছিলে?"

"শুক্কুরবার দুপুরে।"

"ফুলুবাবুকে কখন দিলে?"

"ফুলুবাবু কলেজ ষ্ট্রীটে বাজারের ভেতর চায়ের দোকানে বসে ছিলেন। আমায় বলে দিয়েছিলেন যেতে। আমি গিয়ে তাঁকে জিনিসটা দিয়ে দিই।"

"তারপর?"

"আমি আর কিছু জানি না বাবু।"

"তুমি কাল কেন প্রেসে যাওনি?"

"ফুলুবাবু আমায় যেতে বারণ করেছিলেন, তুমি এখন প্রেসে যাবে না। দপ্তরিখানাতেও দিনের বেলায় থাকবে না। তোমায় অন্য একটা ভাল কাজ যোগাড় করে দেব।"

পশুপতি আমার গা টিপল।

আমি বললাম, "নিধু, তুমি আমার দেখা প্রুফ আর তার সঙ্গে যে কপি ছিল তা প্রেসে ফেরত দাওনি। কেন?"

"আমি তো প্রেসে যাইনি, বাবু।"

"সেগুলো কোথায় ?"

"আমার কাছেই আছে ?"

"ওগুলো কেউ দেখেছিল ? পড়েছিল ?"

"না, না বাবু," মাথা নাড়ল নিধু। "আমি যেভাবে এনেছিলাম সেইভাবেই রেখে দিয়েছি। বাণ্ডিলটা এখনও ঘরে পড়ে আছে।"

পশুপতি আর আমি একই সঙ্গে বললাম, "তুমি ঠিক বলছ ?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ। ···আপনারা ঘরে আসুন—আমি দেখাচ্ছি।"

নিধু আমাদের নিয়ে ঘরে ঢুকল। বাতি জ্বেলে দিল। চতুর্দিকে বাঁধাইখানার নোংরা। তারই মধ্যে থাকে নিধু। একটা কুলুঙ্গির মধ্যে থেকে সত্যিই নিধু প্রুফের বাণ্ডিল বার করে দিল।

আমি একবার দেখলাম।

তাহলে ?

পশুপতিও ভাবছিল, তাহলে ?

আমি আবার বললাম, "নিধু, তুমি ঠিক জানো, এই প্রুফ কেউ পড়েনি ?"

"হ্যাঁ বাবু, কেউ পড়েনি।"

"তা হলে মহিমবাবুকে কেমন করে মারা হল ?"

নিধুই হঠাৎ বলল, "বাবু, আমি একটা কথা শুনেছি। আমার কানে গিয়েছিল। মহিমবাবু বাড়ি ফেরার আগে জল আর এক কাপ পাতলা চা খেতেন। জল দোকানেই থাকত। চা আসত দোকান থেকে। কী যেন নাম দোকানটার। ফুলুবাবুর ওই দোকানে আসা-যাওয়া ছিল। চায়ের সঙ্গে কিছু মিশিয়ে দিয়েছিলেন কি না ফুলুবাবু বলতে পারব না।"

আমরা যেন চমকে উঠলাম। মনে হল, এটা হতে পারে। একেবারেই অসম্ভব নয়। মহিমবাবু বিষ-মেশানো চা খেয়েই রিকশায় উঠেছিলেন। হয়তো দশ-বিশ মিনিট সময় গিয়েছে বিষের ক্রিয়া হতে। তারপর তিনি জানতেও পারেননি কেমনভাবে মৃত্যু এসে তাঁকে এ জীবনের মতন ঘুম পাড়িয়ে দিয়ে গেল।

আমি বললাম, "পশুপতি! নিধুই ঠিক বলেছে বোধ হয়।"

পশুপতি মাথা নাড়ল।

সেই রহস্যময় কুয়াশা

বিকেলের দিকে হাতের কাজকর্ম শেষ করে চা খাচ্ছি, আমার ফোন এল অফিসে।

রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বললেই ও-প্রান্তে কমলেন্দুর গলা। স্পষ্ট করে কিছুই বলল না, বার বার সেই একই কথা, তুই একবার চলে আয়। জরুরী কথা আছে। আমি ওয়েট করছি তোর জন্যে।

এক একজন মানুষ থাকে যাদের কাণ্ডকারখানা দেখে আমরা বলি 'অদ্ভুত টাইপ'। কমলেন্দুও হল সেই জাতের মানুষ। সে কখন কী করে, কী বলে, কোথায় যায়—কেউ বুঝতে পারে না। তাকে খেপা বলার উপায় নেই, বললে চটে যাবে, তারপর সারা পৃথিবীর এমন এমন লোকের গল্প বলবে যাঁরা নমস্য ব্যক্তি কিন্তু এক একটি খেপার রাজা।

ক'দিন আগে কমলেন্দু গিয়েছিল চাঁইবাসায়। কেন গিয়েছিল তা জানি না, বলেছিল, জায়গাটার আশ-পাশ একবার দেখতে যাচ্ছি, যতীন একটা ফিল্ম করবে বাচ্চাদের, আমায় সঙ্গে করে জায়গা পছন্দ করতে যাচ্ছে। আমি কিছু ছবি তুলে আনব।

আমরা ভেবেছিলাম, সময়টা খাসা একেবারে ডিসেম্বরের শেষ, জমাট ঠাণ্ডা পড়ছে, কমলেন্দুরা একেবারে বড়দিন পার করে ফিরবে। চাইবাসায় দিব্যি খাবে দাবে ঘুরবে—তোফা থাকবে, বয়ে গেছে কলকাতায় ফিরতে।

তিন দিনের মাথায় কমলেন্দু ফিরে আসবে ভাবতেও পারিনি। আর এমন ভাবে ফোন করল যেন কী একটা ঘটে গিয়েছে বাড়িতে। ওর কথাবার্তা থেকেও কিছু বুঝতে পাবলাম না, শুধু বার কয়েক 'ফ্যানটাসটিক' শব্দটাই যা শুনেছি। ওই শব্দটাও কমলেন্দু হামেশা বলে, বৃষ্টি নামলেও বলে আবার মোহনবাগান গোল খেলেও বলে। অদ্ভুত ছেলে।

অফিস ছুটির পর কোথাও যাওয়া মানে প্রাণটিকে বাসের হ্যাণ্ডেলে না হয় মিনিবাসের পা-দানিতে ঝুলিয়ে দিয়ে যাওয়া। তাই যেতে হল। কমলেন্দু থাকে গড়িয়ায়। শীতের দিন। যেতে যেতে সন্ধে উতরে যাবার জোগাড়।

কমলেন্দু আমার জন্মে হাঁ বসে ছিল। যেতেই তার দোতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে বলল, "এক মিনিট বোস, চায়ের কথা বলে আসি।"

চলে গেল কমলেন্দু। একটু পরেই ফিরল।

"কী ব্যাপার তোর ? এই কলকাতা ছেড়ে চাঁইবাসায় ছুটলি ; আবার ফিরলি ! ব্যাপারটা কী ?" আমি বললাম।

"বলছি। বোস একটু, জিরিয়ে নে।" বলেই কমলেন্দু টেবিল থেকে সিগারেটর প্যাকেট তুলে এনে আমার হাতে দিল।

দু জনেই সিগারেট ধরালাম।

কমলেন্দু বলল, "ভাই, আমি একটা অদ্ভুত জিনিস দেখেছি। ফ্যানটাসটিক। এ রকম জিনিস আর আমি দেখিনি। দেখব না।" বলতে বলতে কমলেন্দুর চোখ বড় বড় উঠল। ওই দেখার পর থেকে আমার এত শরীর খারাপ হল, জ্বর এসে গেল যে আমি আর থাকতে পারলাম না। পালিয়ে এলাম।"

অবাক হয়ে বললাম, "পালিয়ে এলি ? আর যতীন ?

যতীনও চলে এসেছে। তবে আমি যা দেখেছি, যতীন তার সিকির সিকি দেখেছে। তাতেই ওর ভয় ধরে গিয়েছে।"

আমি বললাম, ঠাট্টার গলায়, "দেখেছিস কী। ভূত ?"

"ভূত ! ভূত দেখলে তো ভালই হত। এ ভাই ভূত নয়, ভবিষ্যৎ।"

"ভবিষ্যৎ ! কী বলছিস"

"ওই বললাম। কথার কথা। সত্যি বলতে কী, আমি কী দেখেছি, ভূত ভবিষ্যৎ না বর্তমান বলতে পারব না। এ-জিনিস জীবনে আর দেখিনি।"

আমি অবাক হয়ে কমলেন্দুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কমলেন্দুর মুখ দেখে স্পষ্টই বোঝা যায় সে কেমন বিহ্বল, বিমূঢ় হয়ে রয়েছে। হয়ত ভেতরে ভেতরে সামান্য ভীত। বললাম, "হেঁয়ালি না করে ব্যাপারটা বল। তুই ফিরেছিস কবে ?"

"আজ সকালে।······বলব ব্যাপারটা ?"

"বলতেই তো বলছি।"

কমলেন্দু বলল, "তুই জানিস আমরা গত সোমবার চাঁইবাসায় গিয়েছিলাম। সোমবার রাত্রে গাড়িতে উঠি, মঙ্গলবার সকালে আমাদের যদি কেউ দেখত বুঝত আমরা খুশ মেজাজে এক ভদ্র-লোকের গেস্ট হাউসে বসে চা, সেদ্ধ ডিম আর রুটি মাখন ওড়াচ্ছি। গেস্ট হাউসটা অবাঙ্গালী ভদ্রলোকের। যতীনকে এখান থেকেই কেউ ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। ওই গেট হাউসে আর একটা জিপ।

আমরা চা খেয়ে একবার টহল মারতে বেরুলাম। জায়গাটা ভাল। শীতও পড়েছে প্রচণ্ড। ভালই লাগছিল বেড়াতে। ঘণ্টা খানেক ঘুরে ফিরে আবার গেস্ট হাউসে ফিরে এলাম। গল্প গুজব করলাম দু'জনে অনেকক্ষণ। তারপব স্নানের ব্যবস্থা করলাম।

দুপুরটাও বেশ কাটল। নাক ডাকিয়ে ঘুমোলাম। বিকেলে চা খেয়ে গেলাম এক ভদ্রলোকের বাড়ি। বাঙালী। যতীন তাঁর ঠিকানা নিয়ে গিয়েছিল কলকাতা থেকে। ভদ্রলোক এককালে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট কাজকর্ম করতেন। এখন রিটায়ার্ড লাইফ। খুব গপ্পে লোক। সিংভূমের জঙ্গল তাঁর একরকম নখদর্পণে। তিনি নানান গল্প বললেন, তারপর বললেন, তোমরা তো বাচ্চাদের অ্যাডভেঞ্চারের সিনেমা করতে চাও, তা আমি তোমাদের একটা স্পটের কথা বলতে পারি। কেউ জানে না। নামও শোনেনি। তোমরা এখান থেকে মাইল পাঁচেক দূরে একটা চমৎকার জায়গা পাবে। উত্তরের দিকে। জায়গাটা ভাল বলছি—কারণ ওখানে জঙ্গল পাবে, ছোট ছোট পাহাড় পাবে, মাঠ পাবে, এমন কি একটা

সরু খালের মতন পাবে। এখন অবশ্য শীতকাল, খালে জল নেই। জায়গাটা সুন্দর। বুনো গাছে ফুলটুল দেখতে পাবে, পাখিটাখিও এই সময় পাওয়া যায়।

"যতীন ঠিক করল, কাল সকালেই যাবে, জায়গাটা দেখতে। আমার কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু এমন কপাল ভাই, সকালে জিপ বার করতে গিয়ে দেখা গেল গাড়ি গোলমাল করছে। ড্রাইভার বলল, মিস্ত্রী ধরে এনে সারাতে হবে। দেরি হবে খানিকটা।"

"মিস্ত্রী ধরে এনে সারাতে যে সারা বেলা কেটে যাবে বুঝিনি। ড্রাইভার গিয়ে মিস্ত্রী ধরে আনল ঘণ্টা খানেক পরে। তারপর সেই যে বসল মিস্ত্রী যন্ত্রপাতি খুলে—পুরো বেলাটা কেটে গেল। তা আমরা ঠিক করলাম বিকেলেই যাব মাত্র তো পাঁচ মাইল রাস্তা, গাড়িতে আর কতক্ষণ। বরং বিকেলেই ভাল হবে।" কমলেন্দু একটু থামল।

আমাদের চা খাবার এসেছিল। কমলেন্দু শুধু চা খাবে। আমার জন্যে বউদি কিছু সুখাদ্য পাঠিয়ে দিয়েছেন, বাড়িতে তৈরী কচুরি আর হিং দেওয়া আলুর দম। মেজো বউদি এসে খাবার চা দিয়ে গেলেন!

বলতে লজ্জা নেই আমার খিদে পেয়েছিল। তার ওপর কচুরি আর আলুর দমের যে রকম সুবাস উঠছিল তাতে আমার মন তখন খাবারের দিকে, কমলেন্দুর দিকে নয়।

কমলেন্দু বলল, "বিকেলে আমরা জিপ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আগেভাগেই বেরুলাম, কেননা পাঁচটা বাজতে না বাজতেই তো অন্ধকার হয়ে যাবে। আমাদের জিপের ড্রাইভারের নাম তারক। লোকটা জোয়ান। গাড়ি ভালই চালায়। একমাত্র দোষ হল, বড় বেশী হর্ণ বাজায় অকারণে।

"তা জায়গাটায় পৌঁছে আমাদের ভালই লাগল। যদিও সঙ্গে আমার ক্যামেরা ছিল, দু একটা ছবিও তুললাম, কিন্তু ঠিক হল, কাল সকালে এসে ভাল করে সব দেখতে হবে। তখন বেশ কিছু ছবিও তোলা হবে।

“জীপের কাছে ফিরে এসে যতীত বলল, সে এমন একটা জায়গা চায়—যেখানে অনেকটা ঢালু মাঠে, মাঠের পর আবার চড়াই, একটা ভাঙাচোরা পুরোনো বাড়ি বা বড় বড় পাথর-টাথর পড়ে আছে—এ রকম হলে ভাল হয়।

“তারক আমাদের কথা শুনছিল। বলল, আর খানিকটা এগুলেই ও-রকম ভাঙা গড় চোখে পড়বে। এদিকে বিকেল মরে যাচ্ছিল. তবু যতীন বলল, চলো একবার দেখে যাই।

“আমরা আবার জীপে উঠলাম। তারক আমাদের ভাঙা গড় দেখাতে নিয়ে চলল। খানিকটা রাস্তা, তারপর আর রাস্তা নেই ঝোপজঙ্গল মাঠের ভেতর যেতে যেতে অন্ধকার হয়ে গেল। আর বেশি এগুনো উচিত হবে না ভেবে তারক বলল. স্যার, আমরা আজ ফিরি কাল সকালে আসব। আমরাও রাজী হলাম তারকের কথায়। বিকেল বলে তখন আর কিছু ছিল না। হু হু করে অন্ধকার হয়ে যাচ্ছে। কনকন করছে শীত। জোর বাতাস দিচ্ছিল শীতের।

“তারক গাড়ি ঘুরিয়ে সামান্য এগিয়েছে হঠাৎ একটা চাকা গেল ফেঁসে! তার মানে এখন চাকা পালটাও। অন্তত দশ পনেরো মিনিটের ধাক্কা। তারক বসল চাকা পালটাতে, যতীন তাকে সাহায্য করতে লাগল। গাড়ির ব্যাপার যতীন কিছু কিছু জানে, আমি কিছুই নয়। আমাদের সঙ্গে টর্চ ছিল না। খুব ভুল হয়ে গিয়েছিল টর্চ সঙ্গে করে না নিয়ে গিয়ে। তারক কিছু শুকনো পাতা-টাতা পায়ে করে টেনে জোগাড় করল, আর যতীন তার লাইটার দিয়ে সেগুলো জ্বালিয়ে দিল। ঠিক মতন জ্বালিয়ে দিল। ঠিক মতন জ্বলছিল না পাতাগুলো। কিন্তু অন্য কোনো উপায় ছিল না।

“ওরা চাকা পালটাচ্ছে দেখে আমি কাছেই পায়চারি করছিলাম। করতে করতে সামান্য এগিয়ে গিয়েছি হঠাৎ কেমন যেন লাগল। কেমন লাগল ঠিক বোঝানো মুশকিল। মনটা আচমকা ভীষণ

খারাপ হয়ে গেল ঝট করে, অস্বস্তি হতে লাগল, বুকের মধ্যে একটা কষ্টের মতন, নিঃশ্বাস নিতেও একটু কষ্ট হচ্ছিল। কেন এ রকম হচ্ছে বুঝতে পারলাম না। সামনে তাকিয়ে থাকলাম। অদ্ভুত লাগছিল। খানিকটা তফাত থেকেই যেন কুয়াশা জমতে জমতে ক্রমশই গাঢ় হয়ে গেছে। একেবারে যেন কুয়াশার নদী। দূরের কিছু দেখা যাচ্ছে না। আমার চোখের সামনে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শুধু কুয়াশার নদী বয়ে যাচ্ছে। আর অদ্ভুত কাণ্ড, মনে হচ্ছিল আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তার সামান্য দূর থেকে যেন কারা চলে যাচ্ছে, পায়ের শব্দের মতন লাগছিল, অথচ কাউকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, সবই কুয়াশায় ডোবা।

"আমার ভীষণ ভয় করছিল, খালি মনে হচ্ছিল ওই কুয়াশা যেন আমায় জোর করে ওখানে টেনে নিচ্ছে। একবার যদি টেনে নেয়, আমি আর ফিরতে পারব না। আমার শরীর অসাড় হয়ে যাচ্ছিল।

"যতীনরা আমার থেকে পঞ্চাশ ষাট গজ দূরে। শুকনো পাতা পুড়ছে তখনও। ওদের আমি দেখতেও পাচ্ছিলাম। ভয় পেয়ে আমি যতীনকে ডাকতে লাগলাম।

"আমার চিৎকার শুনে যতীন ছুটতে ছুটতে কাছে এসে দাঁড়াল। আমি তাকে কুয়াশার দিকটা দেখালাম। ততক্ষণে ঘন কুয়াশা একেবারে ফিকে হয়ে আসছে। পাতলা ধোঁয়ার মতন দেখাচ্ছিল। আমরা দুজনেই দেখলাম, ছায়ার মতন কিছু লোক যেন কোথায় চলে যাচ্ছে। ঠিক যেন তীর্থযাত্রী।

"তারপর সব মিলিয়ে গেল। মিলিয়ে যাবার পর আমি বুঝলাম। এতক্ষণ যে ঘন কুয়াশা নদীর মতন আমার চোখের সামনে ছিল সেটা স্বাভাবিক কুয়াশা নয়। সেটা কী তাও আমি জানি না। তবে জঙ্গলের মধ্যে স্বাভাবিক কুয়াশা ওই সন্ধ্যের মুখে ও-রকম হবার কথা নয়।

আমার মতন যতীনও অবাক হয়েছিল। কিন্তু সে যেটুকু

দেখেছে তাতে আমার মতন ভয় পাবার কথা নয়। তবু যতীনও খানিকটা অসুস্থ বোধ করেছে, ভয় পেয়েছে।

"আমার শরীর বেশ খারাপ লাগলেও আমরা পরের দিন সকালে জায়গাটা দেখতে গিয়েছিলাম। তবে কোনো রকম অস্বাভাবিকতা দেখিনি। বিকেলেও চেষ্টা করেছিলাম যাবার—সেই রিটায়ারড ফরেস্ট অফিসার বারন করলেন। আমরা আর ওখানে থাকতে ভরসা পাচ্ছিলাম না। অন্তত আমার শরীর মন খুব খারাপ লাগছিল। কলকাতায় চলে এলাম।"

"একটা কথা তোকে বলি, কলকাতায় ফিরেও আমার শরীরটা ভাল লাগছে না। ডিপ্রেসানের মতন লাগছে। এখন কী করা যায় বল তো? তোকে তাই ডেকেছি।

কমলেন্দুর সব কথা শুনে আমার মনে হল, ও মুখে যা বলছে বোধহয় তার কিছুটা সত্যি, কিছুটা বানানো। বানানো মানে মিথ্যে কথা নয়, অনেক সময় আমরা যা বাস্তবিক দেখি না তাও কেমন দেখেছি বলে মনে হয়। এই ভ্রম মানুষেরই হয়। বিশেষ করে আমরা যখন অন্যমনস্ক থাকি, অসুস্থ থাকি, উদ্বিগ্ন থাকি, কিংবা কোনো ঘোরে থাকি। আমার বুদ্ধিমতে বলে, কমলেন্দু বাস্তবে যা দেখেছে তার চারগুণ বেশি দেখেছে কল্পনায় বা ভ্রমে।

কথাটা কমলেন্দুকে বলতেই সে চটে গেল। বলল, "আমি কি নেশাখোর যে তোর সঙ্গে গাঁজাখুরি গল্প করছি?"

আমি বললাম, "নেশাখোরের কথা হচ্ছে না। আমার কথাটা শোন। শীতকালে সন্ধ্যের দিকে জঙ্গলে কুয়াশা দেখা তো হাজার রকম কলকব্জা, হুট করে আমাদের শরীর খারাপ হয় না কী? সব সময়েই হয়। অসুস্থ শরীরে ওই সন্ধ্যের সময় জঙ্গলে চোখের ভুল বা মনের ভুল হতেই পারে।"

কমলেন্দু বলল, "না, আমি ভুল দেখিনি। আর আমার এমন কোনো অসুখও নেই যে হুট করে শরীর খারাপ হবে!

"কী জানি ভাই! তা হলে বলতে হবে—তুই যা দেখেছিস সেটা ভুতুড়ে কাণ্ড।

কমলেন্দু বলল, "বেশ তাই হল। কিন্তু তোকে আর লেকচার মারতে হবে না। আমাকে তুই একবার তোর মেসো-মশাইরের কাছে নিয়ে চল। ওঁর সঙ্গে কথা বলব।"

বুঝলাম, কমলেন্দুর কাছে আমি নিমিত্ত মাত্র, আসল হলেন আমার মেশোমশাই বললাম, "বেশ তো, কালই চল, এ আর এমনকি হাতিঘোড়া কাজ!"

"তোকে ফোন করব অফিসে?"

"কোনো দরকার নেই। তুই বিকেলে চলে আয় আমার কাছে। দুজনে চলে যাব। মেশোমশাইকে বরং আমি বলে রাখব।"

"সেই ভাল।"

কথাবার্তা শেষ করে আমি উঠে পড়লাম।

* * *

[আমার মেসোমশাই কোনো বিখ্যাত ব্যক্তি নন। তিনি না বিজ্ঞানী না ভূত-প্রেত বিশারদ। সাদামাটা চাকুরে। এক বিদেশী ল' বকস্-এর দোকানে চাকরি করেন। হিসেব পত্র দেখার দায়িত্ব তাঁর।

[পেশায় অ্যাকাউন্টটেণ্ট হলেও নেশায় অন্য জাতের। উনি 'কুপারস' সোসাইটি বলে এক সমিতির মেম্বার। 'কুপারস' সোসাইটির ঘাঁটি হল বিলেতে, খাস লণ্ডন শহরে। সোসাইটির কাজ হল পৃথিবীর যেখানে যত অদ্ভুত, অবিশ্বাস্য, অ-প্রাকৃত ঘটনা ঘটছে তা জোগাড় করে তার রেকর্ড রাখা। বছরে একবার সেই রেকর্ড ছাপা হয়। গ্রসভেনার কোম্পানী সেটা ছাপে। অনেক নাম করা লোক সমিতির মেম্বার। তাঁরা রেকর্ড থেকে নানা জিনিস জানতে পারেন। আলোচনাও করেন প্রয়োজন মনে করলে।

[আমার মেসোমশাই এই সমিতির একজন সদস্য। তার অবশ্য কাজ হল, আমাদের এদিকে—যেমন বাংলায়, আসামে, উড়িষ্যার যদি কোনো অদ্ভুত অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটে—আর তার খবর

কাগজে পত্রে ছাপা হলে তিনি সেটি রিপোর্ট লিখে যথাস্থানে পাঠিয়ে দেন। ভারতের নানা জায়গায় 'কুপারস' সোসাইটির লোক আছে। মেসোমশাইয়ের এই কাজে প্রচণ্ড নেশা।

*　　　　*　　　　*

[কমলেন্দুকে সঙ্গে করে মেসোমশাইয়ের কাছে নিয়ে গেলাম।

[বাড়িতে মেসোমশাইয়ের নিজস্ব একটি আস্তানা আছে সেখানে বই, ম্যাপ, গ্লোব আর কাগজের ছড়াছড়ি। টাইপ রাইটার মেশিন আছে। আরও কত কী

(কমলেন্দুকে খাতির করে বসালেন মেসোমশাই। কফি আর কেক খাওয়ালেন আমাদের। কথা শুনি?"

(কমলেন্দু আমাকে যা বলেছিল—আগাগোড়া বলল আবার

(মেসোমশাই খুব মন দিয়ে সব শুনলেন।

কমলেন্দু তার যা বলার সবই বলে চুপ করে গেল।

মেসোমশাই কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলেন। তারপর উঠে গিয়ে খুঁজে খুঁজে একটা ম্যাপের বই বার করে আনলেন। এগুলো অনেকটা সার্ভে ম্যাপের মতন। নিজেই সিংভূম অঞ্চলের একটা ম্যাপ বার করলেন। তাতে বিশেষ কোনো সুবিধে হল না। অত ছোট্ট একটু জায়গা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। তবু দেখি মেসোমশাই কাগজে কিছু নোট করে নিলেন।

আমি বললাম, "ব্যাপারটা কী মেসোমশাই?"

মেসোমশাই বললেন, আমি তো ঠিক বলতে পারব না। তবে কমলেন্দু যা বলছে—আমি পুরোটা লিখে ওকে দিয়ে দেখিয়ে, সই করিয়ে জায়গা মতন পাঠিয়ে দেব।

কমলেন্দু আমাকে দেখিয়ে বলল, "বিশু বলছিল, ব্যাপারটা আমার মনগড়া।"

মেসোমশাই মাথা নাড়ালেন, বললেন, "আমার তা মনে হয় না। তুমি হঠাই এই মনগড়া কথা বলতে যাবে কেন? তোমায় কী লাভ।"

আমি বললাম, "না, তা নয় মেসোমশাই। কিন্তু এমন তো পারে—কমলেন্দু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছিল, সেই অবস্থার জঙ্গলের কুয়াশার মধ্যে কিছু ভুল দেখেছ বা ভেবেছ, অনেকটা দুঃস্বপ্নের মতন।

মেসোমশাইয়ের চুরুট নিভে গিয়েছিল। চুরুট জ্বালাতে বললেন, "হতে পারে না তা নয়, বিশু; তবে নাও হতে পারে।"

"তার মানে ?"

"মানেটা এক কথার বোঝানো যায় না। তবু বলি। প্রথমত ধরো, কমলেন্দু তোমার বয়েসী ছেলে। ওর শরীর স্বাস্থ্য তোমার চেয়ে ভাল। ঝপ করে ওর শরীর খারাপ নিশ্চয় হতে পারে, কিন্তু তাই কি সচরাচর হয়। এই যে তুমি অফিস যাও, আমি অফিস যাই, আমাদের কি ঝপ করে কোনো বড় রকম শরীর খারাপ হয় ? যদি রোগ থাকে তবে হতেই পারে। স্বাভাবিক স্বাস্থ্যে চট করে বড় কিছু হয় না। কাজেই স্বাভাবিক, সুস্থ. ছোকরা-বয়েসী একজনের হঠাৎ শরীর খারাপ হবে কেন ? কমলেন্দুর কোনো রোগ আছে কি ?"

মাথা নাড়ল কমলেন্দু। "না।"

'ঠিক বলছ তো ?'

কমলেন্দু বলল, 'না, মেসোমশাই আমার কোনো রোগ নেই।'

মেসোমশাই বললেন, "তা হলে, আমার মনে হয়, কমলেন্দু যা দেখেছে তা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তার চেয়েও বড় কথা ওর যে হঠাৎ শরীর খারাপ লেগেছে—তারও একটা কারণ আছে।"

আমি আর কমলেন্দু মুখ চাওয়া চাওয়ি করলাম। কারণটা কী জানার জন্যে কৌতূহল হচ্ছিল।

মেসোমশাই বললেন, 'তোমরা হয়ত জানো না লেথব্রিজ বলে এক ব্রিটিশ পণ্ডিত একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। লেথব্রিজের পুরো নাম টি. সি. লেথব্রিজ। ভদ্রলোক একজন নাম করা

এথনোজিস্ট এবং আর্কিওলজিষ্ট। এথ্‌নোলজিষ্ট কথাটার মানে বোঝ ? সোজা করে বলতে হলে—মানুষ কী ভাবে আলাদা আলাদা জাতি হয়ে গেল, কেমন করে জাতি ভাগ ঘটল, পরস্পরের সম্পর্ক, বৈশিষ্ট্য, এই সব নিয়ে যাঁরা মাথা ঘামান, গবেষণা করেন তাঁদের বলা এথ্‌নোলজিষ্ট।...তা লেথব্রিজ সাহেব নানা গবেষণা করতে করতে একবার এক অভিজ্ঞতা থেকে একটি তত্ত্ব খাড়া করেন। তত্ত্বটি হল, পাহাড়, জল, মরুভূমি এবং কোনো কোনো ফাঁকা জায়গার এক এক ধরণের ম্যাগনেটিক ফিল্ড আছে যাকে আমরা বাংলায় বলি চৌম্বক ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রগুলি মানুষের কাছে ধাঁধার মতন। আমরা স্পষ্ট করে কিছুই বুঝতে পারি না. কিন্তু এই পাহাড়, নদী, প্রান্তর—এক এক সময় আমাদের ভীষণ বিভ্রমে ফেলে।'

কমলেন্দু আমার দিকে তাকাল। আমি তার দিকে। আমরা কেউই কিছু বুঝতে পারলাম না।

মেসোমশাই বললেন, 'দাঁড়াও, তোমাদের একটা বই দেখাই।'

উঠলেন মেসোমশাই। তাঁর ঘরে বইপত্রের অভাব নেই। বই আর কাগজ সবই বেশ গুছিয়ে রাখা।

খোঁজাখুঁজি করে একটা বই এনে আবার বসলেন। বললেন, 'এর মধ্যে লেথব্রিজের নিজের দু একটা অভিজ্ঞতার কথা আছে। দেখাচ্ছি তোমাদের।'

বইয়ের পাতা হাতড়ে মেশোমশাই ঠিক জায়গাটি বার করলেন। এগিয়ে দিলেন কমলেন্দুর দিকে।

কমলেন্দু বই নিল। পড়ল। তারপর আমায় দিকে দিল। যথেষ্ট আগ্রহ নিয়েই পড়লাম আমি। পড়ে দেখলাম, লেথব্রিজ যা লিখেছেন তা যদি সত্যি হয়—তবে কমলেন্দুর সব কথাই মেনে নিতে হয়।

বইয়ে কিছু লেখা থাকলেই তা কী সব সময় মেনে নিতে মন চায় ? আমি বললাম, 'মেসোমশাই, আপনার লেথব্রিজ সাহেবও এমন এক পরিবেশের কথা লিখেছেন যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি

কমলেন্দুর মতনই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। সেই হঠাৎ কেমন মন-ভেঙে পড়া ভাব, গা-বমি গা-বমি অনুভূতি, ভয় ভয় অবস্থায়। আর ওই অবস্থায় তিনি তো প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার একটা ঘটনা দেখেছিলেন। এখন কথা হল, স্থানমাহাত্ম্যে এত ঘটনা কী ঘটে ?

মেসোমশাই আমার ঠাট্টাটা বুঝতে পারলেন। বললেন, 'ঘটে যে তা আমি জোর করে কেমন করে বলব ? আবার ঘটে না তাও বলব না। সব জায়গায় যে ঘটছে তাও তো নয়। পৃথিবীর সব জায়গায় মাটি খুঁড়লেই যেমন কয়লা বা তেল পাওয়া যায় না—সেই রকম যে কোন নদী, পাহাড়, মরুভূমি কিংবা ফাঁকা জায়গায় গিয়ে পড়লেই যে তুমি ম্যাগনেটিক ক্ষেত্র পাবে তা নয়। কোথাও থেকে যায়। কেমন করে যায়, কোথায় থাকে—তা আমি বলতে পারব না। খুবই আচমকা, হঠাৎ হয়ত সে-জায়গায় আমরা গিয়ে পড়ি। কমলেন্দু কিছু না জেনেই সেই রকম এক জায়গায় গিয়ে পড়েছিল।'

আমি বললাম, 'বেশ, আপনার প্রথম কথাটা না হয় স্বীকার করাই গেল। কিন্তু কমলেন্দু কুয়াশার মধ্যে ঝাপসা কিছু মানুষ দেখেছে—তাদের গায়ের শব্দ শুনেছে—তার কী যুক্তি দেখাবেন।'

চুরুটের ছাই ঝেড়ে মেসোমশাই বললেন, 'অতীতের কোন কোনো ঘটনা এই ভাবে আচমকা আমাদের চোখে ভেসে আসে। সেটা নিশ্চয় তোমার আমার কথা মতন বাস্তব নয়। কিন্তু আসে। এ-রকম বহু ঘটনার কথা পৃথিবীর নানা জায়গায় শোনা গিয়েছে। রেকর্ড করা আছে। তার মধ্যে একটি অদ্ভুত ঘটনা হল ফ্রান্সের এক জায়গায় দু ভদ্রলোক, একান্ন বাহান্ন সাল নাগাদ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের একেবারে শেষের দিকের এক যুদ্ধের দৃশ্য দেখতে পেয়েছিলেন। ঘণ্টা খানেকেরও বেশি তাঁরা এটা দেখেন। পরে পুরোনো কাগজপত্র হাতড়ে জানা গেল, মিত্র শক্তির সৈন্য বাহিনী যখন যুদ্ধ জয়ের পথে এগিয়ে চলেছে তখন ওই বিশেষ জায়গায় ওই

সময় মিত্রশক্তি ও তার শত্রু পক্ষের এক ঘোরতর মাঠ-ময়দানের লড়াই হয়। ভদ্রলোকরা সেটা দেখেছিলেন। ঘণ্টা খানেক ওই ওই সব দেখার পর আবার সব শান্ত স্বাভাবিক।"

"হ্যাঁ কিন্তু দেখেছি বললেই তো সেটা সত্যি হয় না মেসোমশাই, যুক্তি কী!" আমি বললাম।

মেসোমশাই বললেন, "যুক্তি নেই বলেই তো এ-সব ঘটনা রহস্য বলে খাতাপত্রে লেখা থাকছে। তবে মোটামুটি দু-একটা যুক্তি দেখানোও হয়। যেমন, লেথব্রিজস সাহেব বলছেন, এই ধরনের কোনো কোনো জায়গায় যে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড' বা বৈদ্যুতিক চুম্বক ক্ষেত্র তৈরী হয়, সেই চুম্বক ক্ষেত্র ঘটনাটি ধরে রাখে। কেমন করে ধরে রাখে সেটা আমরা পক্ষে বোঝানো সম্ভব নয়। তবে ধরো টেপ রেকর্ডারে আমরা যেভাবে শব্দ ধরে রাখি মতন একটা ব্যাপার।"

কমলেন্দু বলল, "গ্রামোফোন রেকর্ডেও তো আমরা শব্দ ধরে রাখি।"

"হ্যাঁ, "মেসোমশাই বললেন, "মানুষ এক সময় যা অসম্ভব ভাবে —পরে বিজ্ঞান পাঁচ রকম হাতড়াতে হাতড়াতে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলে। রেকর্ড, রেডিয়ো, সিনেমা, টেলিভিসন—এসবও তো এক সময়ে অসম্ভবের পর্যায়ে ছিল। আজ আর ওর কোনোটাই অদ্ভুত নয়, রহস্যময় নয়। এমন কি চাঁদে পাড়ি দেওয়াও গা সওয়া ব্যাপার হয়ে গেল।

আমি বললাম, 'যা অতীত তা হলে কোথাও লুকোনো আছে?'

মেসোমশাই মাথা নাড়লেন, বললেন, 'তোমার প্রশ্নের জবাব আমার জানা নেই। তবে কমলেন্দু যদি সেদিন ওই অবস্থায় কুয়াশার মধ্যে কিছু লোকজন ঝাপসা ভাবে দেখে থাকে—তবে আমি অন্তত অবিশ্বাস করব না।'

'কেন?'

'এই জন্যে যে, সেদিন ওই সময় যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড

বিশেষ জায়গায় তৈরি হয়েছিল, বা ওখানে বরাবরই আছে, কমলেন্দু তার কাছাকাছি হওয়া মাত্র অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর ওই ফিল্ডে সে এমন এক দৃশ্য দেখেছে যা অতীতের। হয়ত একদল মানুষ ওই জঙ্গল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল—কোন'দিন, সেটা ধরা থেকে গেছে। আচমকা ছবিটা এসেছিল, আবার সেটা হারিয়ে গেল। প্রকৃতির খেয়াল, মানুষের সাধ্য কী বোঝে।···যাক্ গে, কমলেন্দুর ব্যাপারটা আমি আমাদের সোসাইটিতে রেকর্ড করার জন্যে পাঠিয়ে দেব।'

আমি বললাম, 'আজকাল সবাই ডাইমেনসান, ডাইমেনসান বলে। এর সঙ্গে কী তার সম্পর্কে আছে ?'

মেসোমশাই বললেন, 'হ্যাঁ, আজকাল ডাইমেনসান বেড়েই যাচ্ছে। ফোর্থ, ফিফথ, সিক্সথ। হতে পারে দৃষ্টির বাইরে যে ডাইমেসান, তার আচমকা খেয়ালে এ-সব হয়। পৃথিবী বড় বিচিত্র বিশু, প্রকৃতি আরও বিচিত্র। যতটুকু আমরা জানি বা বুঝি। কতটাই বা দেখতে পাই।"

বাইরে এসে কমলেন্দু বলল, 'বিশু, আমি আর একবার চাঁই-বাসায় যাব। যাবি তুই।'

'না', আমি মাথা নাড়লাম।' তোদের ওই ইলেকট্রো-ম্যাগনেটি ফিল্ড আমার সহ্য হবে না।

—[]—

☐ আগন্তুক ☐

অফিসে আমার ফোন-টোন বড় আসে না। ছোট অফিস। চার পাঁচটা মাত্র ঘর। ফোন বলতে মাত্র দুটি। একটা থাকে ডক্টর দাশগুপ্তর ঘরে, অন্যটা আমাদের অ্যাকাউন্টেন্ট বিরামবাবুর টেবিলে। সেদিন শনিবার, অফিস বন্ধ হবার সময় হয়ে এসেছে এমন সময় ফোন এল আমার।

বিরামবাবু ডাকলেন। "তোমার ফোন রজত।"

উঠে গিয়ে ফোন ধরতেই ওপাশ থেকে নন্তুদার গলা। নন্তুদা আমার পিসতুতো ভাই। আমার প্রায় সমবয়সী, মাস আষ্টেকের বড়। যদিও দাদা বলি, তবুও আমার খুব বন্ধু।

নন্তুদা ফোনে বলল, "তার ছুটি হয়ে গেছে ?"

"না, হব-হব করছে।"

"ছুটি হলে সোজা এখানে চলে আয়।"

"কেন, যাচ্ছ নাকি কোথাও ? সিনেমা ? টিকিট কেটেছ ?"

"হ্যাঁ। তাড়াতাড়ি আসবি।"

"হাউসটা বলে দাও না, আবার তোমার ওখানে ছুটব !"

"হাউস !······ম্যাড্ হাউস······!"

"অ্যাঁ—!"

"এখানে আয়। তাড়াতাড়ি।" নন্তুদা ফোন রেখে দিল।

ব্যাপার কিছুই বুঝলাম না। অবাক হলাম।

নন্তুদা এক সময়ে চাকরি বাকরি করত। ছেড়ে দিয়েছে। ফোটো তোলায় তার বরাবর সখ ছিল, নেশা ছিল; তুলতে তুলতে হাত বেশ পাকা হয়ে যায়। বার কয় প্রাইজও পেয়েছে তার ফোটোর জন্যে। নামটাম হয়ে যাবার পর নন্তুদা চাকরি বাকরি ছেড়ে দিয়ে ওয়েলেসলির কাছে এক ফোটোর দোকান দেয়। তার কিছু চেনাজানা খদ্দের আছে, তারা নন্তুদার দোকান ছাড়া অন্য

কোথাও যায় না। একটা ফোটো তোলার দোকান চালিয়ে যে যথেষ্ট আয় হয় নন্তুদার তা নয় ; তবে বাড়িতে কোনো দায় দায়িত্ব নেই। পিসেমশাইয়ের ভাল আয়। নন্তুদার মাথার ওপর সন্তুদা, কাজেই স্টুডিও খুলে বসে থেকে দিব্যি চলে যাচ্ছে ওর।

আমার অফিস ফ্রি স্কুল স্ট্রীটে। হেঁটেই চলে যাওয়া যায় নন্তুদার স্টুডিওতে। ছুটির পর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কলকাতায় সবেই বর্ষা নেমেছে। বৃষ্টি যে তেমন হচ্ছে তা নয়, তবে মেঘলা ভাবটা থাকছে সারাদিনই, দু এক পশলা হালকা বৃষ্টিও হচ্ছিল।

হুস করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে যাবার পর আমি নন্তুদার স্টুডিওর দিকে পা বাড়ালাম। রাস্তায় জল নেই, কাদা কাদা ভাব রয়েছে।

নন্তুদা যে কেন ডেকে পাঠাল বুঝতে পারছিলাম না। সিনেমায় হোক কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি! নন্তুদার এক বড়লোক বন্ধু আছে—মাঝে মাঝে গাড়ি নিয়ে এসে উঠিয়ে নিয়ে যায় নন্তুদাকে। ব্যারাকপুর, বেহালা, বারাসাত—যেখানে হোক বেড়াতে চলে যায়।

নন্তুদার দোকান মোটামুটি সাজানো-গোছানো। সামনেটায় বসবার জায়গা, খদ্দের এসে বসে। আশেপাশে, ফোটোর দোকান যেমন হয়, শো-কেসের আড়ালে নন্তুদার তোলা ভাল ভাল কয়েকটা ফোটো। ফোটো তোলা ফিল্মের বড়সর এক বিজ্ঞাপন একপাশে। এইরকম নানা জিনিস। বসার জন্যে একটা চেয়ারে, বড় সোফা। দোকানের পেছন দিকে নন্তুদার ফোটো তোলার স্টুডিও, তারই পাশে খুপরি মতন বন্ধ এক ঘরে ফিল্ম ধোওয়ার ব্যবস্থা।

দোকানে পৌছে দেখি নন্তুদা কতকগুলো খুচরো কাজ সারছে। মুখ তুলে বলল "তোর অফিসে ফোন পাওয়ার কি ঝামেলা রে!"

বসতে বসতে বললাম, "লাইনটা গণ্ডগোল করছে ক'দিন। তারপর খবর কি বলো? হঠাৎ ডাকলে?"

"খবর বলব বলেই তো ডাকলাম। বস, চা খা। বলছি। বাইরে আকাশ কেমন?

"নিজেই তো দেখতে পাচ্ছ।"

"ঢালবে মনে হচ্ছে?"

"মেঘলা বেশ। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি পড়ছে।"

হাতের কাজ সেরে নন্তুদা দোকানের বাইরে মুখ বাড়িয়ে অনাদিকে ডাকল। অনাদি পাশাপাশি দুটো দোকানে কাজ করে, ফাই ফরমাস খাটে, দোকান পরিষ্কার করে।

অনাদিকে চা আর ওমলেট আনতে বলে নন্তুদা চেয়ারে বসে পড়ে একটা সিগারেট ধরাল। তারপর বলল, 'তোকে একটা অদ্ভুত ব্যাপার শোনাব। শুধু শোনাব না, একজনকে দেখাব…।"

"আমি ভাবলাম তুমি সিনেমা-টিনেমা দেখাবে; না হয় বেড়াতে নিয়ে যাবে কোথাও।

"সিনেমা তো তুচ্ছ রে! ব্যাপারটা যদি শুনিস…।"

"বলো শুনি।" আমার তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না শোনার শনিবারের বিকেলটা বরবাদ হল। কোথাও গিয়ে কিছু একটা দেখলে হত। কপালে নেই।

নন্তুদা বলল "আজ হল তোর শনিবার। গত সোমবার এক ভদ্রলোক আমার দোকানে এসেছিলেন ছবি তোলাতে। এই দিককার লোক। নাম বললেন, এস. ডলবি। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। বয়েস মন্দ না, ধর—পঞ্চাশের ওপর। মাথায় ভীষণ লম্বা, ছ'ফুটের ওপর, রোগাসোগা দেখতে। তা ভাই, আমি ওঁর ফোটো তুলে—বুধবার আসতে বললাম প্রিণ্টটা নিয়ে যাবার জন্যে। এখন হল কি, মঙ্গলবার যখন ডেভেলাপ করতে বসলাম, ও হরি, একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। ফিল্মে কিছুই আসে নি। বার তিনেক নিয়েছিলাম। একবারও ছবি এল না। ব্যাপারটা মাথায় এল না। হল কী? ফিল্ম খারাপ? লেন্সের গোলমাল হল কিছু? ব্যাপারটা মাথায় ঢুকল না। আজকাল ফিল্মের কোয়ালিটি খারাপ হয়ে গেছে। কিন্তু ঐ রোলটার আগে পরে সব ঠিক আছে, মাঝখান থেকে হল কেমন করে? কিছুই আমার মাথায় এল না।…বুধবার সন্ধের

দিকে ডলবি এল তার ছবি নিতে। মিথ্যে কথাই বলতে হল। বললাম, সাহেব—, ডেভেলাপ করার সময় আমার একটু গাফিলতি ঘটে গেছে। তখন কট করে লোডশেডিং হয়ে গেল। নেগেটিভ সামলাতে পারি নি। তুমি দয়া করে আজ আর একবার বসো, আমি ফোটো তুলে নিচ্ছি। তা সাহেব কোনো আপত্তি করল না, রাগারাগিও করল না, স্টুডিওর মধ্যে বসল চেয়ারে। আমি যত্ন করে আবার তুললাম।······সেই নেগেটিভের কি অবস্থা হয়েছে দেখবি ?

আমার খানিকটা কৌতূহলই হচ্ছিল। বললাম, "দেখি।"

নন্তুদা উঠল। উঠে তার 'ডার্করুমে' চলে গেল। ফিরে এল সামান্য পরে, হাতে ফিল্মের রোল। বলল, "এই দেখ।"

চোখের সামনে নন্তুদা যেটা মেলে ধরে দেখাল, তাতে আমার কিছু চোখে পড়ল না প্রথমে। তারপর ভাল করে নজর করতে দেখলাম, ধোঁয়ার মতন কিছু যেন ফুটে রয়েছে। একেবারেই অস্পষ্ট। মানুষের মুখ চোখের কোনো আদল কোথাও নেই।

"আমার কিছু নজরে আসছে না।" আমি বললাম, "ধোঁয়ার মতন একটু কী দেখছি।" নন্তুদা বলল, "ঠিকই দেখছিস। এবারেও ওঠেনি।"

"এটা তা হলে কী ?"

"ভগবান জানেন।"

"দু দু'বার তুমি ছবি তুলতে পারলে না ?"

"কোথায় আর পারলুম ! আমার প্রফেসানাল লাইফে এ-রকম আর হয়নি। ব্যাপারটা অদ্ভুত।"

"ফিল্মের দোষ ?"

"না। ফিল্মের নয়। ক্যামেরার নয়।"

"তা হলে ?"

"সেটাই তো বুঝতে পারছি না।"

আমি বেশ অবাক হয়ে বসে থাকলাম কিছুক্ষণ বললাম, "তা

তুমি আমায় ডেকে আনলে কেন। আমি স্কটোর ব্যাপার কিছু বুঝি না।"

নন্তুদা বলল, "তোকে ডাকলাম অন্য কারণে। সেই সাবেব আজ আবার আসবে। তার ছবি নিতে। তুই একবার চোখে দেখতো তাকে। একজন জলজ্যান্ত মানুষের ছবি উঠল না দু দু'বার ব্যাপারটা কী? লোকটা কি মানুষ নয়। ভূত! না, ওর কোনো ট্রিক আছে?···লোকটাকে দেখাবার জন্যে তোকে ডাকলাম।"

অনাদি চা ওমঁলেট নিয়ে এল।

আমার ওমলেট খেতে খেতে কথা বলতে লাগলাম।

"কখন আসবে তোমার সেই সাহেব?"

"সন্ধের আগেই।"

"সে তো অনেক দেরী"

"কোথায় আর!"

"আমি না হয় ঘুরে আসি খানিকটা।"

"কোথায় যাবি ঘুরতে। বৃষ্টি-বাদলার দিন, রাস্তাঘাটের যা অবস্থা।" অগত্যা বসে থাকতে হল নন্তুদার দোকানে।

বৃষ্টিটা আবার এক পশলা হল। জোরেই। থেমেও গেল। মাঝে মাঝে টিপ টিপ করে পড়ছিল, চলেও যাচ্ছিল। মেঘলার দারুন ছ'টা বাজার অনেক আগেই ঝাপ্সা হয়ে গেল।

নন্তুদার সঙ্গে গল্পে গল্পে সময় কেটে গেল। সন্ধে হয়ে আসছে দেখে আমি বললাম, "এবার তা হলে তোমার সেই সাহেব আসবে?"

"হ্যাঁ; এই সময়েই আসবে।"

ছ'টা বেজে গেল। রাস্তার দোকানে পশারে বাতি জ্বলে উঠেছে অনেকক্ষণ। বৃষ্টির সেই একই অবস্থা, আবার টিপটিপ করে জল পড়ে চলেছে। বাড়ি ফেরার সময় হয়ত ভিজতে হবে। ভাবছিলাম, আর আর খানিকটা বসে উঠে পড়ব। এমন সময় লম্বা গোছের একজন দোকানে ঢুকল।

নন্তুদা কিছু না বললেও আমি বুঝতে পারলাম, ডলবি সাহেব।

এই রকম মানুষ আমার আগে কখনও চোখে পড়েনি। মাথায় খুবই লম্বা। সোয়া ছ'ফুটের কম নয়। রোগা টিঙ টিঙ করছে। মুখটাও লম্বা। থাঁচের চোয়ালের হাড় ফুটে আছে, যেন মুখ বলতে ওই হাড়ই, লম্বা। নাক, হাড়ের চামড়া লাগানোর মতন দেখায়, চোখ দুটো গভীর গর্তে ঢোকানো, কপালে অজস্র দাগ। মাথায় চুল প্রায় নেই। নেড়া নেড়া দেখায়। মানুষটাকে দেখলে মনে হয়, রোগে রোগে শেষ হয়ে গিয়েছে, মুখটুখ একেবারে মোমের মতন সাদা দেখতে, চোখের জমিটা হলুদ, দাঁত নোঙরা। সাহেবের পরনে প্যান্ট, বেশ পুরানো, গায়ে বে-মাপের কোট। গলায় একটা রুমাল জড়ানো।

নন্তুদা ডলবি সাহেবকে দেখে রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিল। কী বলবে বুঝে উঠতে পারছিল না।

সাহেব হিন্দী আর ভাঙা ইংরেজী মিলিয়ে যা বলল, তার মানে দাঁড়ায় এই জলবৃষ্টির মধ্যে তাকে আসতে হল বাধ্য হয়েই, ফোটোর জন্যে।

নন্তুদা ঢোঁক গিলে আমতা আমতা করে বলল, সাহেবের ছবি সে তুলতে পারেনি, আবার নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

সাহেব যে প্রচণ্ড রেগে তা নয়, তবে খুশী হল না। বিড়বিড় করে আপন মনে কিছু বলল। বলে আর দাঁড়াল না, দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

নন্তুদা বলল, "দেখলি" ?

"দেখলাম। একেবারে স্কেলিটন দেখতে, কিন্তু মানুষ তো।"

"আমিও তো তাই বলছি। মানুষই, ভূত নয়। কিন্তু ওর ফোটো কেন আসছে না ?"

কেন আসছে না আমার জানার কথা নয়। চুপ করেই থাকলাম।

আর খানিকটা পরে বললাম, "আমি তা হলে এবার যাই। তোমার দেরী আছে।"

"না না, আর একটু বোস। একসঙ্গেই যাব।"

কেন যে ডলবির ফোটো উঠল না তাই নিয়ে নানান রকম গবেষণা করতে লাগল নন্তুদা। আমি চুপচাপ শুনে যেতে লাগলাম।

সাতটা বাজল। উসখুস করছিলাম আমি।

নন্তুদা দোকান বন্ধ করার তোড় জোড় শুরু করল।

আমরা প্রায় উঠব, এমন সময় এক বুড়ী দোকানে ঢুকল। অ্যাংলো বুড়ী। পোশাক আশাক কেমন ময়লা পুরোনো।

বুড়ী দোকানে ঢুকে একটা ছাতা একপাশে রাখল।

নন্তুদা বলল, "কেয়া মাঙ্‌তা?"

বুড়ীর হাতে প্লাসটিকের ছোট্ট হ্যাণ্ডব্যাগ। ব্যাগ খুলে একটা কার্ড এগিয়ে দিল নন্তুদার দিকে।

নন্তুদা বুড়ীর দিকে তাকাল "হ্যাঁ, হামারা কার্ড।"

বুড়ী বলল, "ফোটো দেও। হামারা লেড়কাকা।"

"কোন লেড়কা?"

"কার্ড দেখো।"

নন্তুদা আবার কার্ডটা দেখল। তারপর বলল, "ডলবি?

মাথা নাড়ল বুড়ী। "হ্যাঁ।"

নন্তুদা আমার দিকে তাকাল। ভ্যাবাচেকা খেয়ে গিয়েছে যেন। তারপর বুড়ীর দিকে তাকিয়ে বলল, "ফোটো নেই হ্যায়। খারাপ হো গিয়া হ্যায়।"

বুড়ী কেমন অবাক হয়ে নন্তুদার দিকে তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, "খারাপ হো গিয়া! মাই গড্।

বুড়ী আরও একটু দাঁড়িয়ে থেকে কেঁদে ফেলল।

নন্তুদা অপ্রস্তুত হয়ে বলল, "ডলবি আয়া থা।"

"কব?"

"আজ ভি আয়া থা। থোড়া আগাড়ি।"

বুড়ী কান্না থামিয়ে বলল, "ঝুট মাত বলো"

নন্তুদা বোকার মতন তাকিয়ে থাকল বুড়ীর দিকে।

বুড়ী আবার বলল, "ঝুট বাত বোলনা নেহি চাহিয়ে।"

"ঝুট নেহি। সাচ বাত।"

বুড়ী ভীষণ চটে গেল। তারপর শাসাবার ভঙ্গিতে বলল, "বাবু তুম খারাপ আদমি। বহুৎ খারাপ। হামরা লেড়কা মর গিয়া হ্যায়। তুম তামাশা লাগাতে হো!

নন্তুদা চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল। তারপর বুড়ীর দিকে। "মর গিয়া হ্যায়? কব?"

"কাল।"

নন্তুদা মাথা নাড়ল জোরে। বলল, "নেহি। কভি নেহি।"

বুড়ী বিড়বিড় করে কি বলতে বলতে করে রাস্তায় নেমে গেল।

নন্তুদা আমার দিকে তাকাল। "কী বলে রে, মরে গেছে! মরা মানুষ দোকানে আসে, কেমন করে?"

আমি বোকার মতন বললাম, "মরার আগে তোমার কাছে এসেছিল, মরার পরও।"

নন্তুদা বলল, "বুড়ীর মাথা খারাপ। ওর ছেলে বেঁচে আছে।"

আমি বললাম। "তা তো স্বচক্ষেই দেখলাম। কিন্তু বাঁচা মানুষের ফোটো কেন উঠল না সেটাই বুঝতে পারলাম না।"

নন্তুদা কোন জবাব দিল না।